অবস্থায় ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, ক্লোম-রস সেই উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে। ক্লোমরসের কার্য্য শক্তি অনেক। ক্লোমরস দুগ্ধকে দধির আকারে পরিণত করে, পাচক রসের ন্যায় খাদ্যের nitrogenous অংশকে Peptone নামক পদার্থে দ্রব করে, খাদ্যের শ্বেতসার পদার্থের যাহা লালারস এবং পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না, তাহাকে শর্করায় পরিণত করে এবং খাদ্যের মাখনের অংশকে অতি সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করে। যকৃৎ হইতে যে পিত্তরস ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবাহিত হয় তাহা সাধারণতঃ পরিপাক কার্য্যে ক্লোমরসকে সাহায্য করে। পিত্তরসেরগুণ alkaline ইহার রঙ সবুজ। ইহাতে জল খনিজ পাদার্থ, রঙ করিবার জিনিস, bile acids, chotesterin এবং মেদ আছে। বয়স্কেরা যে খাদ্য আহার করে—তাহার যে অংশ মুখের লালারস এবং পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না তাহা এইরূপে ক্ষুদ্র অন্ত্রে ক্লোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। খাদ্য এইরূপে লালারস, পাচক রস, পিত্তরস এবং ক্লোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিয়া যায়। এই পদার্থকে Chyle বলে। যে গুণে ক্লোমরস শ্বেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে, শিশুর ক্লোমরসে সে গুণ জন্মের প্রথম কয়েক মাসে বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে শিশুকে শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য দিলে তাহা তাহার মুখেও দ্রবীভূত হয় না এবং অন্ত্রের মধ্যেও জীর্ণ হয় না; শিশু নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

আমাদের খাদ্যদ্রব্য নানাপ্রকার রসের দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া যে তরল আকার ধারণ করে তাহা পাকস্থলী এবং অন্ত্রের গাত্রাবৃত ত্বকে যে সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী সকল আছে, তাহাতেই প্রধানতঃ প্রবেশ করে। খাদ্য গ্রহণের পর আমাদের পাকস্থলী অন্ত্রে প্রবাহিত রক্ত খাদ্যের সার অংশের দ্বারা উপরোক্ত ভাবে পুষ্ট হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে বাহির হইয়া একটি শিরা দিয়া যকৃতে প্রবেশ করে। যে দ্বার দিয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে পরিপুষ্ট রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে তাহাকে ইংরাজিতে Portal Vein বলে। এই রক্ত যকৃতে প্রবেশ করিলে পর যকৃত তাহাকে পরিবর্ত্তিত করে অর্থাৎ রক্তের যে উপাদান-বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া দিয়া সার অংশ গ্রহণ করে। এই পরিত্যক্ত জিনিসটি পিত্ত। ইহা যকৃৎ হইতে বাহির হইয়া পিত্ত-কোষে গিয়া সঞ্চিত হয়। এইরূপে রক্ত যকৃৎ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহের রক্ত স্রোতের সহিত মিশিবার উপযুক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খাদ্যের মাখনের অংশ ক্লোমরস দ্বারা অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরের গাত্রে যেমন বহুসূক্ষ্ম বহা নালী সকল আছে,তেমনি ইহা একপ্রকার সূক্ষ্ম শুঁয়া দ্বারা আবৃত। ইহাকে ইংরাজীতে 'ভিলি' (Villi) বলে। প্রত্যেক ভিলাসের ভিতর বহু সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী আছে এবং ২।১টি করিয়া এক প্রকারের নালী আছে, তাহাকে ল্যাকটিয়ালস্ (lacteals) বলে। খাদ্যের মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে পর ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রের ভিতর দিয়া চোয়াইয়া ভিলির অভ্যন্তরস্থ ল্যাকটিয়ালে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ এই ল্যাকটিয়ালগুলি বৃহত্তর হইতে

থাকে এবং আমাদের বুকের পশ্চাদ্দিক দিয়া যে একটি লম্বা নালী গিয়াছে তাহার মধ্যে এই ল্যাকটিয়ালগুলি তাহাদের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যের মেদময় পদার্থ চালিয়া দেয়। এই নালীকে বক্ষঃনালী thoracicduct বলে। এই নালী গলার বাম দিকের বৃহৎ শিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। খাদ্যের মেদময় পদার্থ thoracic duct দিয়া এই বৃহৎ শিরার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান দ্রবীভূত হইয়া সাধারণতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ত্বকে স্থিত রক্তবহা নালীতে প্রবেশ করে এবং খাদ্যের মেদময় পদার্থ উপরোক্ত ল্যাকটিয়াল্ দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবার জন্য চারিটি রসের আবশ্যক হয়।

(১) লালা রস (২) পাচক রস, (৩) পিত্ত রস এবং (৪) ক্লোম রস।

খাদ্য দ্রব্য মুখে যাইবা মাত্র লালারস খাদ্যের শ্বেতসার পদার্থের উপর কার্য্য করে এবং ইহাকে শর্করায় পরিণত করে। খাদ্য দ্রব্য এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র পাচক রস ঐ খাদ্যের উপর কার্য্য করে। তখন খাদ্যের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন ঘটে। (১) লালারস দ্বারা খাদ্যের শ্বেতসার উপাদানের কতক অংশ শর্করায় পরিণত হইয়াছে। (২) মাংসের ন্যায় পদার্থের কিয়দংশ পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়াছে। এই দু'টি পদার্থ এবং যে পানীয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পাকস্থলীর রক্তবহা নালী চুষিয়া লইয়াছে।

তারপর (১) শ্বেতসার এবং উদ্ভিদ্ পদার্থ পাকস্থলীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (২) মাংসের ন্যায় পদার্থের অবশিষ্টাংশ নরম এবং টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (৩) খাদ্যের মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া তৈলের গুলির আকারে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর পাচকরস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া খাদ্যের যে যে অংশ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে—তাহা টক। এই টক খাদ্যাংশ অন্ত্রে প্রবেশ করিবামাত্র পিত্ত রস এবং ক্লোম রস ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই দু'টি রসের গুণ, লালারসের ন্যায়, টকের বিপরীত। সুতরাং তাহারা—বিশেষতঃ পিত্তরস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রসের প্রধান গুণই এই যে, ইহা পাচকরসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করিলে পর তবে ক্লোম রস খাদ্যের উপর কার্য্য করিতে পারে, সামান্য টক থাকিলেও ক্লোমরস কার্য্য করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্লোমরস খাদ্যের সমস্ত উপাদানই জীর্ণ করে। লালারস, পাচক রস এবং পিত্তরস খাদ্যের উপর কার্য্য করিয়া যে সকল উপাদান জীর্ণ করিতে পারে না, ক্লোমরস তাহা সবই জীর্ণ করে। এই তিন রসের ক্রিয়া শেষ হইবার পরও খাদ্যের যে শ্বেতসার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, ক্লোমরস তাহাকে জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করে, যে মাংসময় উপাদান অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্রবীভূত করে এবং পিত্তরসের সাহায্যে মেদময় পদার্থকে সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করে। আমাদের আহার্য্য দ্রব্য যখন সমস্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন ক্লোমরস ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে

থাকে। ক্লোমরস দ্বারা জীর্ণ হইবার পর খাদ্যের উপাদান গুলিকে ভিলি (villi) চুষিয়া লয়। শর্করা ও মাংসের রসকে রক্ত বহা নালী এবং মেদময় উপাদানকে ল্যাকটিয়াল্‌স্‌ চুষিয়া লয়। জীর্ণ করা খাদ্যের অধিকাংশই ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিলি চুষিয়া লয়।

এইরূপে খাদ্য জীর্ণ হইয়া বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে খাদ্যের অসার অংশ মল রূপে বহির্গত হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে রক্ত মোক্ষণ।

রক্ত মোক্ষণ দ্বারা অনেক রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে রক্তমোক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য রক্ত মোক্ষণের বিষয় আলোচনা করিব। রক্ত মোক্ষণ এক সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসায় বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে উহা উঠিয়া যায়। এদেশে রক্ত মোক্ষণের জন্য জলৌকা, শৃঙ্গ, অলাবু এবং শস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ করা হইত। ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিষয় বলা যাইতেছে।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্ব্বল, স্ত্রী ও সুকুমার ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে জলৌকার প্রয়োগই অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। জলৌকা, অলাবু এবং শৃঙ্গ এই ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা রক্তমোক্ষণের মধ্যে জলৌকা প্রয়োগই প্রধানতম।

অপিচ, বাতদুষ্টরক্ত—শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্ত দুষ্ট রক্ত—জলৌকা দ্বারা এবং কফ দুষ্ট রক্ত অলাবু দ্বারা মোক্ষণ করা যায়। কারণ শৃঙ্গ স্নিগ্ধ বলিয়া বায়ুতে হিতকর, জলৌকা শীতল বলিয়া পিত্তে হিতকর এবং অলাবু রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর। আবার ত্রিদোষ দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্য উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শৃঙ্গ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে, যে স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে—সেই স্থান অল্প অল্প চিরিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র সংযোগে শৃঙ্গের স্থূল মুখ তথায় এমন ভাবে বসাইবে—যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পরে ছিদ্রের অন্য মুখে মুখ দিয়া জোরে চুষিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

অলাবু দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে পীড়িত স্থান অল্প অল্প চিরিয়া মধ্য স্থলে প্রজ্বলিত দীপবর্ত্তি সংযুক্ত অলাবু যন্ত্র তথায় স্থাপিত করিবে। ইহাতে রক্ত মোক্ষণ হইয়া থাকে।

জলৌকা প্রয়োগ :—জল ইহাদিগের আয়ু, এজন্য ইহাদিগকে জলৌকা বলে। আবার জল ইহাদিগের ওকা অর্থাৎ বাক্য স্থান এই জন্য ইহাদিগকে জলাযুকা বলে। জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয় প্রকার নির্ব্বিষ এবং ছয় প্রকার সবিষ।

কৃষ্ণা, কর্ব্বূরা আলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা এই ছয় প্রকার

জলৌকা সবিষ। অঞ্জন চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূল মস্তক বিশিষ্ট জলৌকাকে কৃষ্ণা বলে। বাইন মাছের ন্যায় আয়ত এবং উদরের কোথাও উন্নত ও কোথাও ছিন্নবৎ—এরূপ জলৌকাকে কার্ব্বুরা বলে। কুঞ্চিত অঙ্গ রোগমুক্তবৎ বিস্তৃত পার্শ্ব বিশিষ্ট ও কৃষ্ণা মুখ জলৌকাকে অলগর্দ্দা বলে। ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় উর্দ্ধ রেখা দ্বারা চিত্রিত জলৌকাকে ইন্দ্রায়ুধ বলে। ঈষৎ কৃষ্ণ পীত বর্ণ বিচিত্র পুষ্পের আকৃতির ন্যায় চিত্র বিচিত্র অঙ্গ জলৌকাকে সামুদ্রিকা বলে। যে সকল জলৌকার অধোভাগে ষাঁড়ের কোষের ন্যায়, দুই ভাগে বিভক্ত এবং মুখ সূক্ষ্ম তাহাদিগকে গোচন্দনা বলে।

সবিষ জলৌকা দংশন করিলে দষ্ট স্থানে অত্যন্ত শোথ ও চুলকণা, হয় এবং মূর্চ্ছা জ্বর, দাহ, বমি, মত্ততা ও অবসন্নতা—এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইন্দ্রায়ুধ নামক জলৌকায় দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সবিষ জলৌকায় দংশন করিলে বিষ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, সেই ঔষধ পান, লেপন ও নস্যাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কু মুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীক মুখী ও সাররিকা এই ছয় প্রকার জলৌকা নির্ব্বিষ। ইহাদের মধ্যে যে সকল জলৌকার দুই পার্শ্ব মনঃশিলার ন্যায় বর্ণে রঞ্জিত এবং পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুগের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তাহাদিগের নাম কপিলা। যাহারা অল্প রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, গোলাকার, পিঙ্গল বর্ণ এবং শীঘ্র গামিনী তাহাদের নাম পিঙ্গলা। যাহারা যকৃতের ন্যায় নীল-লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, শীঘ্র রক্তপায়ী, এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট তাহাদিগকে শঙ্কু মুখী বলে। যাহারা ইন্দুরের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত তাহাদিগকে মূষিকা বলে। যাহারা মুগের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং রক্ত পদ্মের ন্যায় মুখ যুক্ত তাহাদের নাম পুণ্ডরীক মুখী। আর যে সকল জলৌকা স্নিগ্ধ, পদ্ম পত্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ তাহাদিগের নাম সাররিকা। এই সাররিকা জলৌকা হস্তী, অশ্বাদি পশুদিগের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। মনুষ্যদিগের চিকিৎসা কার্য্যে কদাচ এই জলৌকা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

যবন বা তুরস্ক দেশ, পাণ্ড্য (কাম্বোজের দক্ষিণ এবং পুরাতন দিল্লীর পশ্চিমে অবস্থিত) দেশ, সহ্য নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী সহ্য নামক পার্ব্বত্য দেশ এবং মথুরা দেশে দীর্ঘকায়, হৃষ্ট পুষ্ট ও অধিক রক্তপায়ী জলৌকা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সবিষ মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র ও পুরীষ দ্বারা পূতি ভাবাপন্ন কলুষিত জলে সবিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর পদ্ম উৎপল, কুমুদ, শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন নির্ম্মল জলে নির্ব্বিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নির্ব্বিষ জলৌকা সকল ক্ষেত্রে ও সুগন্ধি জলে বিচরণ করে, বিষাক্ত দ্রব্য আহার করে না এবং পঙ্কে বিচরণ করে না।

শরৎকালে কাঁচা চামড়া বা সদ্যাহত জন্তুর অর্দ্ধাবয়ব দ্বারা জলৌকা ধরিতে হয়। তৎপরে একটী বৃহৎ নূতন ঘটে সরোবর বা দীঘির জল এবং পঙ্ক রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়। উহাদের আহারের জন্য শুষ্ক মাংস, শৈবাল এবং পদ্ম ও উৎপলাদির কন্দ চূর্ণ করিয়া দিতে হয় এবং থাকিবার জন্য তৃণ জলজ পত্র দিতে হয়। দুই তিন দিন অন্তর জল বদলাইয়া দিতে হয় এবং নূতন করিয়া খাদ্য দিতে হয়। সাত দিন অন্তর অন্য ঘটে স্থাপন করিতে হয়।

যে সকল জলৌকার দেহের মধ্যভাগ স্থূল যাহারা ক্লিষ্ট; অত্যন্ত দীর্ঘ ধীরে ধীরে গমন করে, পীড়িত স্থানে সহজে সংলগ্ন হয় না, অল্প রক্ত পান করে এবং যাহারা সবিষ—এই জলৌকা রক্ত মোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে।

ব্যাধি—জলৌকা-প্রয়োগ-সাধ্য হইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া বা উপবেশন করাইয়া, ব্যাধি স্থানে ক্ষত না থাকিলে শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ক্ষত থাকিলে জলৌকা সহজেই সেই স্থান গ্রহণ করে বলিয়া ঐরূপ ঘর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। অনন্তর পাত্র হইতে জলৌকা ধরিয়া তাহার গাত্রে সর্ষপ ও হরিদ্রা বাটা লেপন করিবে। এবং গ্রহণ করার জন্য ক্লান্তিনাশা হেতু মুহূর্ত্তকাল জল পূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে সূক্ষ্ম, শুক্ল এবং আর্দ্র তুলা বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ব্যাধি স্থানে সংলগ্ন করিবে। যদ্যপি জলৌকা রুগ্ন স্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে একবিন্দু দুগ্ধ বা রক্ত সেই স্থানে প্রদান করিবে অথবা সেই স্থানে একটু ক্ষত করিয়া দিবে। ইহাতেও যদি জলৌকা রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই জলৌকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জলৌকা গ্রহণ করিবে।

জলৌকা অশ্বের খুরের ন্যায় মুখ নীচু ও স্কন্ধ উন্নত করিলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জলৌকা ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিলে উহার শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং তদুপরি জলসেচন করিবে। ইহাতে জলৌকা গাত্র শীতল হয় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র রক্তপান করে।

জলৌকা সংলগ্ন স্থানে বেদনা ও কণ্ডু হইলে বুঝিতে হইবে যে, জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে। তখন তাহাকে অপসারিত করিবে। যদ্যপি জলৌকা সহজে পীড়িত স্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার মুখে একটু সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দিবে। ইহাতে জলৌকা নিশ্চয়ই ব্যাধি স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

জলৌকা রক্তপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইলে, উহার গাত্রে চাউলের গুঁড়া মাখাইয়া এবং মুখ লবণ ও তৈল দ্বারা লিপ্ত করিবে। অনন্তর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুচ্ছ দেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে মুখ পর্য্যন্ত মর্দ্দিত করিয়া বমন করাইবে। জলৌকা সম্যক প্রকারে মোক্ষণ করিলে যদি উহাকে জলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আহারের চেষ্টায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে। কিন্তু জলে ফেলিলেও যদি জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্যক প্রকার কার্য্য করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় পুনরায় মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। কেননা সম্যক্ প্রকারে মোক্ষণ করান না হইলে উহাদের ইন্দ্র মদ নামক দুঃসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্যক্ প্রকারে মোক্ষণ করান হইলে জলৌকাকে পূর্ব্ববৎ নিয়মে যথাস্থানে রাখিয়া উপযুক্ত খাদ্যাদি দিয়া পালন করিবে।

জলৌকা প্রয়োগ হেতু সম্যক্ যোগ ব্যতীত রক্তস্রাবের হীন, মিথ্যা এবং অতিযোগ হইতে পারে। সম্যক্ যোগ হইলে ক্ষত স্থানে শত ধৌত ঘৃত মর্দ্দন বা শত ধৌত ঘৃতযুক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন করিবে। হীন-যোগ হইলে রক্তস্রাবের জন্য ক্ষতস্থান মধু দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অতিযোগ হইলে শীতল জল সেচন করিবে অথবা শীতল জলাক্ত বস্ত্রখণ্ড

দ্বারা বন্ধন করিবে। মিথ্যাযোগ হইলে মধুর দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলোকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে রোগীর বল, শরীরের আয়তন, দোষের বল, দোষের প্রমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় রক্তমোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। ব্যাধি স্থান অল্প হইলে অল্প রক্ত এবং বৃহৎ হইলে অধিক রক্ত মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে কি পরিমাণ রক্তমোক্ষণ করান উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ মাত্রার রক্তস্রাব করান যায় না বলিয়া পরিমাণ লিখিত হইল না।

শস্ত্র দ্বারা রক্ত মোক্ষণ।

ত্রিদোষজ ব্যতীত পঞ্চবিধ বিদ্রধি (বড়-কোড়া), কুষ্ঠ, বেদনাযুক্ত বাতব্যাধি (Nervous disease), শরীরের একদেশ আশ্রিত শোথ, কর্ণপালি বাতরোগ সকল, গোদ, বিষাক্ত রক্ত, আব্, বিসর্প, বাতজ গ্রন্থি, পিত্তজ গ্রন্থি, কফজ, গ্রন্থি, বাতজ উপদংশ, পিত্তজ উপদংশ, কফজ উপদংশ, স্তনরোগ সমূহে বিদারিকা, ক্রিমি দন্তক, দন্তবেষ্ট; উপকুশ, শীতাদ, পিত্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, রক্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, কফজ ওষ্ঠ ব্যাধি এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র রোগে রক্ত মোক্ষণ কার্য্য প্রশস্ত। ক্ষীণ ব্যক্তির শোথ হইলে এবং পাণ্ডু, অর্শ, উদর শোষ রোগী ও গর্ভিণী স্ত্রীর শোথ হইলে রক্ত মোক্ষণ নিষিদ্ধ।

বায়ু দূষিত রক্ত ফেণাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, পাতলা, শীঘ্র প্রসরণ শীল হয় এবং সহজে জমিয়া যায় না। পিত্ত দূষিত রক্ত নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিত বর্ণ, শ্যাম-বর্ণ (হরিত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ) কাচা মাংসের ন্যায় গন্ধযুক্ত, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অনভিলষিত (অর্থাৎ মক্ষিকাদি পিও দূষিত রক্ত খায় না) সহজে জমিয়া যায় না। কফ দূষিত রক্ত গেরিমাটী মিশ্রিত জলের ন্যায় পাণ্ডু লোহিত মিশ্রিত বর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, ঘন, পিচ্ছিল, মাংস পেশীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে স্রাব হইয়া থাকে। ত্রিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত ভিন্ন ভিন্ন দোষ দূষিত রক্তের লক্ষণ যুক্ত কাঁজির ন্যায় আভা বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। দ্বিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে দুই দোষের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তদোষজনক কারণে দূষিত রক্ত—পিত্ত দুষ্ট রক্তের লক্ষণ যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

যে রক্ত ইন্দ্রগোপ নামক কীটের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, অতি তরল বা অত্যন্ত ঘন নহে, এবং আলতা, কুঁচ প্রভৃতির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট—সেই রক্ত বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

অস্ত্র দ্বারা দুই প্রকারে রক্তমোক্ষণ করান যাইতে পারে। অসময়ে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কিম্বা চিকিৎসকের দোষে ভাল রূপ অস্ত্র প্রযুক্ত না হইলে, অথবা অত্যন্ত শীতাধিক্য কিম্বা বাতাধিক্য কালে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে, ভোজনের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরেই শস্ত্র প্রয়োগ করিলে এবং রক্ত গাঢ় হইলে রক্তস্রাব হয় না অথবা স্রাব হইলেও অল্প মাত্রায় হইয়া থাকে।

যাহারা মদ্যপান বা বিষ পান করিয়াছে, যাহারা মূর্চ্ছাগ্রস্থ, যাহাদের বায়ু, মূত্র ও ও পুরীষের অবরোধ ঘটিয়াছে এবং যাহারা নিদ্রাভিভূত বা ভীত,—শস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের রক্তস্রাব হয় না।

এই সকল কারণে রক্তস্রাব না হইলে, সেই দুষ্ট শোণিত শরীরে থাকিয়া কণ্ডু. শোথ,

দাহ, পাক ও বেদনা জন্মায়; অনভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক, অত্যন্ত উষ্ণ কালে, ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায়, অতিরিক্ত স্বেদ দেওয়ার পরে রক্ত মোক্ষনার্থ শস্ত্রপাত করিলে অথবা অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতএব নাতিশীতোষ্ণকালে, রোগীকে অধিক স্বেদ না দিয়া অথবা সূর্য্য বা অগ্নিতাপে অধিক তাপিত না করিয়া প্রথমে তিলের যবাগূ পান করাইয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে শিরঃ শূল, অন্ধতা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগ, তিমির রোগ, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গ রোগ, তৃষ্ণা দাহ, হিক্কা, শ্বাসকাস ও পাণ্ডু-রোগ জন্মিতে পারে—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

রক্তস্রাব হইতে হইতে যখন দেখিবে যে, রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ রক্তস্রাব হইতেছে অথবা রক্ত-স্রাব আপনা হইতে বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা দেহের লঘুতা, বেদনার উপশম, রোগের হ্রাস এবং চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মিয়াছে, তখন সম্যক রক্তস্রাব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রক্ত-মোক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের কুষ্ঠনীলিকাদি ত্বকদোষ, গ্রন্থি রোগ, শোথ এবং রক্তদোষ জনিত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইতে পারে না।

যদ্যপি রক্তস্রাব না হয়—তাহা হইলে, এলাচ, কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদী, দেব-দারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গৃহধুম (ঝুল,) হরিদ্রা, আকন্দের আটা ও ডহর করঞ্জের ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি পাওয়া যায়—তিনটী চারটী বা সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধুনা, রসাঞ্জন, শিমূল, ফুল, শঙ্খ, ঝিনুক, মাষ-কলায়, যব ও গোধূম—এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ (শাল ভেদ), অর্জ্জুন, অরিমেদ (গুয়ে-বাবলা), কাঁকড়াশৃঙ্গী ও ধামন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। কিম্বা কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র দগ্ধ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে অথবা সমুদ্রফেন ও (লাক্ষা) চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পাট বা কার্পাসবস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থানে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেও রক্ত-স্রাব নিবারিত হয়। ক্ষতস্থানে শীতল বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে দিলে, শীতল গৃহে রাখিলে ক্ষতস্থানে শীতল দ্রব্য পরিষেক করিলে বা শীতল দ্রব্য প্রলেপ দিলে, ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শিরা পূর্ব্বে যেস্থানে বিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার নিম্নে সেই শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব নিবা-রিত হয়। অপিচ, রোগীকে কাকোল্যাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কাথে ইক্ষু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, মেষ, শশক, মহিষ, বরাহ প্রভৃতির রক্তপান করিতে দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত, সংস্কৃত মৃগের যূষ ও মাংস রস সহ সুস্নিগ্ধ অন্ন আহার করিতে দিবে। রোগীর অন্য কোন উপসর্গ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে দোষানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অত্যধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে ধাতুক্ষয় বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হয় এবং বায়ু অত্যন্ত কলুষিত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রোগীকে

নাতি শীতল, লঘু স্নিগ্ধ ও রক্তবর্দ্ধক পথ্য, ঈষৎ অম্ল যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তস্রাব নিবারণ করিবার উপায় চারি প্রকার। যথা, সন্ধান, স্কন্দন, দহন ও পাচন। তন্মধ্যে কষায় দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানের সন্ধান বা সঙ্কোচন, শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্তের স্কন্দন, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র ভস্ম প্রয়োগ দ্বারা পাচন এবং দাহ বা দহন দ্বারা শিরা সঙ্কোচন ক্রিয়া করিতে হয়। শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত ঘনীভূত হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে সন্ধান ক্রিয়া করিবে। সন্ধান ক্রিয়া দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে পাচন ক্রিয়া করিবে। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে দহন ক্রিয়া করিবে। এই রূপে রক্তের দোষ নিঃশেষিত রূপে দূর হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ব্যাধি পুনর্ব্বার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে পুনরায় আর রক্তস্রাব না করিয়া সংশমন অর্থাৎ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট দোষের প্রতিকার করিবে। কারণ রক্তই শরীরের মূল ও রক্ত দ্বারাই শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। সেইজন্য রক্তকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত। রক্তকেই জীবন বলিয়া জানিবে।

রক্তস্রাবের পর শীতল পরিষেকাদির জন্য বায়ু কুপিত হইলে ক্ষতস্থানে শোথ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হয়। এরূপ অবস্থায় ঈষদুষ্ণ ঘৃত ক্ষতস্থানে সেচন করিলে প্রতিকার হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

—:০:—

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার এইচ, এল, এম, এস)

যে সকল সদুপায়ে দেহ মনকে পরিচালন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকিয়া সুখশান্তিময় সুস্থভাবে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়—সেই সকল সদুপায়কেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কহে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? এই শব্দটির বিশ্লেষণে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটি সচ্চিদানন্দময় আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম; অপরটির 'চর' ধাতু অর্থাৎ গমন। সুতরাং যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করা যায়—তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম-দর্শন ঘটে বলিয়াই আত্মদর্শনে অমরত্ব লাভ, পক্ষান্তরে আত্ম দর্শনেই মৃত্যু হওয়া বেদশাস্ত্র সম্মত মহাবাক্য *। তাহা হইলে চৌরাশী লক্ষ যোনী পরিভ্রমণান্তর সুদুর্ল্লভ যে মানব-জন্ম, যাহা কেবল ব্রহ্মদর্শন জন্যই অবধারিত

---

* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণতমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা ইতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥ ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্ত।

বেদার্থ প্রতিপাদ্য আদিত্যবর্ণ গুণাতীত পুরুষকে অবগত হইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন মৃত্যু নিবারণের অন্য কোন উপায়ই থাকিতে পারে না।" সুতরাং সেই আত্মদর্শন অভাবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে মানবজাতি মাত্রেরই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের প্রকৃত পন্থাই শ্রবণমননাদি অষ্ট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্রধারণ। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ॥"

যে পুরুষ যে পরিমাণে শুক্রধারণ করে, তাহার জীবন সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও সুখ সেই রূপ হয়, আর যে পুরুষ যে পরিমাণে বিন্দুপাত করে তাহার মৃত্যু সেই পরিমাণে অকালে এবং দুঃখজনকভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শুক্রধারণ অর্থে যে কেবল পুরুষ জাতিরই কর্ত্তব্য তাহা নহে। উহা স্ত্রীজাতিরও অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীজাতিও শুক্র ধারণ রূপ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ না হইলে উৎকৃষ্ট আর্ত্তবলাভে সমর্থা হন না বলিয়া সুসন্তান লাভ করিতে বা দীর্ঘায়ু ও বীর্য্যবতী হইতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীজাতির শুক্র হয় না। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক বাক্য। এজন্য সুশ্রুত বলেন,—

"এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি। স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাং স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি॥"

একমাসে রস পরিপাকান্তে পুরুষের শুক্র রূপে এবং স্ত্রীদিগের শুক্র আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়। "স্ত্রীণাঞ্চ" এই "চ" কার দ্বারা স্ত্রীদিগের শুক্র সমুচ্চিত করা যায়। ইহার প্রমাণও সুশ্রুতেই উক্ত হইয়াছে; যথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষ সংসর্গে শুক্রস্রাবিত হয়; কিন্তু সেই শুক্র গর্ভোৎপত্তির কোনই সহায়তা করে না। ঐ শুক্র শুদ্ধগর্ভের কারণ হয় না। তবে বিকৃত গর্ভের কারণ হইতে পারে।

শুক্র শব্দে শুক্ল বলিলে কোন দোষ দেখা যায় না। কেন না শুক্র বাস্তবিকই নির্ম্মল, নির্ম্মল বস্তু মাত্রেই শুক্ল। আবার 'র' কার ও 'ল' কারে সমানতা থাকা হেতুও বুঝিবার সুবিধার জন্য শুক্ল বলা যায়। ঋষিগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকে রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ছয়টি ধাতুতেই মল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু স্বর্ণ যেমন সহস্রবার দগ্ধ করিলে সুনির্ম্মল হয়, তদ্রূপ রস বারম্বার পরিপক হওয়া প্রযুক্ত নির্ম্মল অবস্থায় শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই শুক্র আবার পরি-পাক হইয়া তাহার সার অংশ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যস্থ স্থূলাংশ শুক্রে পরিণত থাকে আর স্নেহময় সূক্ষ্মাংশ ওজো ধাতু রূপে পরিণত হয়। এই ওজো ধাতু সমস্ত শরীরেই অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল স্থির, শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বল ও পুষ্টি কারক। মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়া-ছেন যে, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাকেই ওজ কহে। সেই ওজো ধাতুই বল নামে অভিহিত হয়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, যে রস হইতে ওজ উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমান্বয়ে সমস্ত ধাতুর স্থান প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে ওজো ধাতুতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব রস যখন যে ধাতুতে উপনীত হয়, তখন উহা সে ধাতুরই তুল্য বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং ওজো ধাতু যে সমস্ত ধাতুরই স্নেহভাগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, ওজো ধাতুতে সেইরূপ বল অবস্থিতি করে। অতএব ওজোধাতুই বল নামে অভিহিত। ওজো ধাতু দশপ্রকার গুণ বিশিষ্ট, যথা,—গুরু, শীতল, কোমল, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রস, স্থির, নির্ম্মল, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম।

দেহে শুক্র রক্ষিত হইলেই ওজো ধাতু

বর্দ্ধিত হয়। ওজো ধাতু বর্দ্ধিত হইলেই দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলবীর্য্য লাভ হইয়া দীর্ঘজীবি হওয়া যায়, এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত উৎসাহ, দেহের শোভা, কমনীয় কান্তি, ধীরতা, লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভুক্ত দ্রব্যের রস সমূহ পুনঃ পুনঃ পরিপক্কতা লাভ করিতে করিতে একমাস কালে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীজাতির আর্ত্তব ও শুক্র রূপে পরিণত হয়। চরকে উক্ত আছে যে, ওজোধাতু অষ্টবিন্দু প্রমাণ, সুতরাং অনুমান হয় যে, উহা বড়জোর বত্রিশ বিন্দু শুক্রের স্বল্পাংশই হইবে। এদিকে একবার স্ত্রীসম্ভোগে যে শুক্র নির্গত হয়, তাহা নিশ্চয়ই বত্রিশ বিন্দু অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। তবে দেখা যায় যে, খাদ্যাদির রস পরিপাকে এক মাসের পরিশ্রমে যে শুক্র টুকু প্রস্তুত হইল, অতি যৎ সামান্য ক্ষণ সুখের লালসায় অমন ব্রহ্মবস্তুকে অনায়াসে অপব্যয় করা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি হইতে পারে? সুতরাং কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—সকলেরই বিশেষ সাবধানতার সহিত শুক্র ধারণ করা অতীব কর্ত্তব্য। কামিনীগণের প্রতি আসক্তিতে বিরক্তি উৎপাদন জন্য দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণ অবধূত গীতাদি শাস্ত্রে অনেক ঘৃণাজনক বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মাতৃস্বরূপা মহিলাগণের মনে আঘাত লাগিবার কথা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, পুরুষ-দেহই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, তখন প্রকৃতি পরিত্যাগের উপায় কি? আমরা একথা বুঝিতে পারি যে—

নৈব স্ত্রীন পুমানেষ ন চৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।

৫ অঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুং ভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ পরং পশ্যতি নারদঃ॥

১ অঃ প্রকৃতিখণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সুতরাং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ভেদ করিয়া কাহারো প্রতি ঘৃণিতোক্তি সমীচীন বোধ করি না।

কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্রধারণ ব্যাপার কার্য্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। এজন্য ইহার অনুষ্ঠানকল্পে যে যে নিয়মাধীন থাকার অভ্যাস করার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার বিবৃত্তিকল্পে আমরা চরক গ্রন্থের শারীর স্থানের ৫ম অধ্যায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—(২১ শ্লোক) "পুরুষ অহংকারাদি দোষে ভ্রাম্যমান থাকে বলিয়া প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রবৃত্তিই পাপের মূল। নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহাই শান্তি, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং মোক্ষ। এক্ষণে মুমুক্ষুর উপযোগী উপায় সকল ব্যাখ্যা করিব। লোকদোষদর্শী মুমুক্ষু ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অগ্নিসেবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসরণ, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবোধ, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপস্তম্ভে আশ্রয় করণ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকরণ, সাধুদিগের উপাসন, অসাধু পরিবর্জ্জন, দুর্জ্জনের সহিত অসঙ্গতি, সত্য, সর্ব্বভূতহিতকর বচন, অপরুষ বচন, অনতিকালে পরীক্ষাপূর্ব্বক বচন, সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মবৎ দর্শন, স্ত্রীদিগের অস্মরণ, * স্ত্রীদিগের অসঙ্কলন, স্ত্রীদিগের অপ্রার্থনা, স্ত্রীদিগের অনভিভাষণ, স্ত্রীদিগের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধ ত্যাগ প্রচ্ছাদনার্থ কৌপীন, (গৃহস্তের পক্ষে অত্যল্প

* আকাশাদি পঞ্চভূত এবংচৈতন্য এই ছয় ধাতুর সমবায়কেই যখন পুরুষ কহে আবার পৃথক চেতনা ধাতুরও পুরুষ সংজ্ঞা হয়, মন ও দর্শেন্দ্রিয় প্রভৃতি অষ্ট প্রকার প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গই যখন পুরুষের আদি

মূল্যের সামান্য বস্ত্র) গৈরিক বসন, কন্থা সীবন হেতু সূচী ও বস্ত্র খণ্ড, শৌচাধান হেতু জল-কুণ্ডিকা, দণ্ড ধারণ ভিক্ষাচর্য্যার্থ পাত্র, (এ গুলি সম্ভবতঃ সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা, কিন্তু গৃহাশ্রপক্ষে ইহার মধ্যে নিবৃত্তি মার্গীয় সম্ভবপর উপায় সকল গ্রহণীয়।) প্রাণ ধারণার্থ বন্য ফলমূলাদি যথাপ্রাপ্তি আহার, শ্রমাপ-নয়নার্থ শীর্ণ শুষ্কপত্র তৃণের আস্তরণ ও উপাধান, ধ্যান হেতু যোগপট, বনে বৃক্ষাদিতলে বাস, তন্দ্রা, নিদ্রা ও আলস্যাদি বিসর্জ্জন, কর্ম্মত্যাগ, বিষয়ে রাগ-দ্বেষ না রাখা, নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার ও অঙ্গ চেষ্টা দির আরম্ভে স্মরণপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া, সৎকার স্তুতি, নিন্দা ও অপমানে ঔদাসীন্য, শ্রম, শীত, উষ্ণ, বাত বর্ষা সুখ ও দুঃখের সহিষ্ণুতা; শোক, দৈন্য, দ্বেষ, মদ, মান, লোভ, রাগ ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া, অহঙ্কার প্রভৃতিকে উপদ্রব জ্ঞান করা, বাহ্যজগতের সহিত পুরুষের সমানতা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা, মোক্ষার্থ কার্য্যকালের অতিক্রম না করা, যোগারম্ভে সর্ব্বদা অনি-র্ব্বেদ সত্ত্বোৎসাহ ও অপবর্গের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান, ইন্দ্রিয়বর্গের শাসন, চিত্তে চিত্তস্থাপন, আত্মাতে আত্ম স্থাপন, ধাতুভেদে শরীরাবয়বের অবধারণ, সমস্ত কারণবৎ দ্রব্যকেই দুঃখময়, অনাত্মীয়, অনিত্য এইরূপ বোধ করা, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকেই দুঃখবোধ এবং সর্ব্ব প্রকার সন্ন্যাসেই সুখবোধ করিয়া অভিনিবেশ, অপ-বর্গের অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বাধা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের উপায় সকল ব্যাখ্যা করা হইল॥ (২৩ শারীর স্থান ৫ম অঃ, চরক।)

এই সকল সুখকর শুদ্ধির উপায় দ্বারা সত্ত্ব বিশুদ্ধ হইয়া তৈলবস্ত্রাদিকরণ যোগে মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয় এবং গ্রহ, মেঘ, ধূলি ও নীহার দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পায়। দীপাশয়ের (লণ্ঠনের) দ্বার বদ্ধ করিয়া দিলে তন্মধ্যে নির্ম্মল শিখাবিশিষ্ট দীপ যেমন স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আত্মাতে শুদ্ধ সত্ত্ব স্থির ভাবে প্রকাশ পায়। (২৪ ঐ) শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে যে শুদ্ধ সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহার বলে অতিবল মহামোহময় তমঃ ভেদ করা যায়, যদ্দ্বারা নিস্পৃহ ব্যক্তি সর্ব্বভাবের স্বভাব অবগত হইয়া থাকেন, যদ্দ্বারা যোগসাধন করা যায়, যদ্দ্বারা সাংখ্য (সংখ্যাতত্ত্ববিৎ) হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে অহংকার থাকে না এবং সুখ দুঃখের কারণ অবগতি হয়; যাহা থাকিলে অন্য কোন অবলম্বন আর আবশ্যক হয় না; যাহা থাকিলে সর্ব্বত্যাগ করা যায়; যাহা থাকিলে নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষয় স্বরূপ পরব্রহ্মে গমন করা যায়, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব-বুদ্ধিই বিদ্যা; সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানস্বরূপ। (২৫ ঐ) যিনি বাহ্যজগতের ষড়্ ধাতুময় আত্মা এবং ষড়্ধাতুময় আত্মাকে বাহ্যজগৎ দেখিতে পান, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ও লোকজ্ঞ মহাত্মার জ্ঞান-মূলা শান্তি কখনই বিনষ্ট হইতে

(৬ শ্লোক শারীর ১ম অঃ) তখন এই হিসাবে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। সুতরাং স্ত্রীঅশ্মরণ পুরুষের এবং পুরুষ অশ্মরণ স্ত্রীদিগের সমান কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে উভয়ের মাখামাখিভাবে বাস অনিবার্য্য। কেবল সংযম অভ্যাসেই পরস্পর অনাসক্ত থাকিতে হইবে। প্রঃ লেঃ।

পারে না। তিনি সর্ব্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় সমুদয় ভূতকেই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনি পরিণামে ব্রহ্মভূত হন এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (২৬ ঐ).

প্রাগুক্ত চরক শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমী ব্যক্তির জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. উহার মধ্য হইতে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য-গুলি বাদ দিয়া লইলেই গৃহীর কর্ত্তব্য সহজে অবধারিত হইতে পারে। ফলতঃ শুক্রধারণ করিয়া উর্দ্ধরেতা হইতে না পারিলে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ অভ্যাস করিতে পরাঙ্মুখ হইলে কখনই মানব আত্মোন্নতি বা বলবীর্য্য লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না। যে কোন কারণে শুক্র নষ্ট হইলেই আত্মক্ষয় হয়, এজন্য স্ত্রীসংসর্গ পুরুষের সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যদি সঙ্গ করত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থঞ্চ জায়তে॥
দত্তাত্রেয়।

যদি স্ত্রীসঙ্গ করে তবে বিন্দু নাশ হয়। বিন্দু নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় ও সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে।

বীর্য্যই ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। বির্য্যের অভাব হইলে মনুষ্যগণের তেজঃ বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফুর্ত্তি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যত্বই নষ্ট হইয়া দেহটি জ্বর, বাত, যক্ষ্মা, প্রমেহ, শ্বাস, রক্তাল্পতা শক্তিহীনতা প্রভৃতি অশেষ রোগের আকর-ভূমি হয়, তজ্জন্যই দেশে অধুনা রোগ সকলের সৃষ্টি হইয়া লোককে চিররুগ্ন এবং অকাল মরণের দিকে অগ্রসর করিতেছে ফলকথা—কি স্ত্রী আর কি পুরুষ—সকলেরই সযত্নে শুক্ররক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এ সকল কথা প্রত্যেকেরই ভাবিবার বিষয়।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(হিক্কা)

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন।)

হিক্কা একটী প্রধান উপসর্গ। ইহা শীঘ্রই জীবনকে হিংসা করে, অথবা কণ্ঠ হইতে পুনঃ পুনঃ হিক্ শব্দ উত্থিত হয়। এই জন্যই ইহাকে হিক্কা বলিয়া থাকে। সুতরাং হিক্কা নিবারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত। পূর্ব্বে যে সমস্ত জঙ্গম বিষযুক্ত ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঔষধ গুলিই সদ্যঃ শ্লেষ্ম প্রশমক এবং সাতিশয় বায়ুবর্দ্ধক। যে প্রকার তাপ দ্বারা সরস বস্তু হইতে প্রথমতঃ রস নির্গত হইয়া পরিশেষে সেই তাপ দ্বারাই আবার

সেই রস ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে থাকে, সেই প্রকার ব্যাধি প্রভাবে, দেহমধ্যে আপনা হইতেই একপ্রকার তীক্ষ্ণ বিষ উৎপাদিত হইয়া প্রথমতঃ শরীরের শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে তরল করিয়া স্রোতোবাহী পথগুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। পরিণামে সেই বিষ দ্বারাই যখন শরীরস্থ বায়ু সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে সহসা সঞ্চালিত করিয়া দিতে পারে না এবং আপনিও শরীর মধ্যে সর্ব্বথা সঞ্চরণশীল হয় না, তখনই হিক্কা বা উর্দ্ধশ্বাস আসিয়া জোটে। দেখিতে দেখিতে অনতি বিলম্বেই শরীর মধ্যে বায়ুর সর্ব্বথা গতিরোধ হইয়া যায়। সুতরাং রোগীও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে ;—জীবনান্ত হইবার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না। এই সময়ে বিহিত বিধানে রোগীর অবস্থা প্রণিধান করিয়া যদি জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই শরীরস্থ প্রাণ নাশক বিষের তেজ হীন-বল হইয়া পড়ে এবং তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশও ক্রমশঃ বিশুষ্ক ও সঞ্চালিত হইতে থাকে। তৎকালে বাহ্য-বিষ-প্রভাবে দৈহিক বায়ু শক্তিমান্ ও প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং বাতাধিক্য বশতঃ নাড়ীর গতিতে ক্রমশঃ চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে থাকে। নাড়ীর স্পন্দনে চঞ্চলতা উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে হইবে যে, দৈহিক বিষের তেজ কমিয়া আসিতেছে। তখন শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া বায়ুর সমতা রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পর যদি নাড়ী ধীরে ধীরে চঞ্চল না হইয়া অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অনুপযুক্ত সময়ে বাহ্য বিষ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রযুক্ত-বিষের অভাব সীমাতিরিক্ত হওয়ায় মুহূর্ত্ত-মধ্যেই শরীরস্থ বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ প্রযুক্ত বিষের দ্বারাই রোগীর জীবনী-শক্তি ক্ষীণ, হীন ও নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিতেছে। বিষ-প্রয়োগের পূর্ব্বেই সবিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিয়া রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা আবশ্যক। উপযুক্ত সময়ে জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিলে যদি সেই বিষের ক্রিয়া ফলিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উপদ্রব নিবারণের জন্য আর দ্বিতীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয় না। প্রযুক্ত জঙ্গমের দ্বারা জীবন বিনাশের মূলীভূত দৈহিক বিষ বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই প্রযুক্ত বিষের পোষকতায় অর্থাৎ শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে আপনা হইতে সকল প্রকার উপদ্রব তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে হিক্কা প্রভৃতির উপদ্রব প্রশমক যতগুলি ঔষধ উল্লিখিত হইতেছে, তৎ সমুদয় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই প্রয়োক্তব্য। হিক্কা নিবারণের জন্য নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে মাষকলাই, হিঙ্গুল অথবা গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে সেই ধোঁয়া প্রদান করিতে হইবে। হিঙ্গুল ও গোলমরিচ গব্য ঘৃতে পেষণ করিয়া একখানি সাদা কাগজে চুরুটের মত শূন্যগর্ভ নল প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার একদিকে আগুন জ্বালাইয়া অন্য দিক্ নাকের কাছে ধরিলে হিক্কা নিবারণ হয়। রজনীগন্ধা ফুলের একতোলা রসে ৫।৬ রতি সোরা গুলিয়া পান করিতে দিলেও তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিয়া যায়। মুড়ি ভিজানো জলের সহিত সাদা চন্দন ঘসিয়া ৩০।৪০ ফোটা স্তনদুগ্ধের সহিত উহা গুলিয়া পান করাইলে পনর মিনিটের মধ্যে হিক্কা-বেগ উপশমিত হয়। নাভির উপরে কাঁসার বাটী রাখিয়া তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিলে বা একখণ্ড বরফ রাখিলে

হিক্কার তিরোধান ঘটে। কস্তুরী ২।৩ মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ডালিমের অথবা বেদানার রস মিশ্রিত করিয়া ২।৩ বার খাইতে দিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমানিও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বাহ্য এবং আভ্যন্তর উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়। বাহ্য প্রয়োগের প্রণালী বস্ত্র খণ্ড আমানিতে সিক্ত করিয়া শিরোদেশে পটী দেওয়ার নিয়ম। বস্ত্রখণ্ড সর্ব্বদাই যেন সুসিক্ত থাকে। অভ্যন্তর প্রয়োগের মাত্রা ২।৩ তোলা। আমরুলের রস—গব্য ঘৃতে মিশাইয়া হরিণের চর্ম্মে জল মাখাইয়া—নির্ধূম মৃদু অঙ্গারাগ্নিতে কণ্ঠে, পার্শ্বে, নাভিদেশে স্বেদ প্রদান করিলে হিক্কা বিলীন হইয়া যায়।

(বমি)।

হিক্কার ন্যায় বমিও একটী প্রধান উপদ্রব। ইহাদ্বারা শীঘ্রই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ধাতু বসিয়া যায়। ইহা স্বরভঙ্গেরও অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত দ্রব পদার্থ পান, অতি স্নিগ্ধ ভোজন, অহৃদ্য আহার, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, দ্রুত ভোজন এবং শ্রম-ভয়-উদ্বেগ-অজীর্ণ-ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও অপরাপর নানাবিধ বীভৎস কারণ বশতঃ বাতাদি দোষত্রয় শীঘ্র উৎক্লিষ্ট ও বেগে ধাবিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়। ইহাকেই (ছর্দ্দি) বমি কহে। বমি হইবার পূর্ব্বে সকলেরই হৃল্লাস, উদ্গার, মুখ হইতে লবণাক্ত পাতলা জলস্রাব এবং পানাহারে নিরতিশয় বিদ্বেষ উপস্থিত থাকে। সাদা জীরা, দূর্ব্বার শিকর, আতপ চাউল, যষ্টিমধু ও কুল বিচির শাঁস—ঠাণ্ডা জলে অথবা বরফ জলে রগড়াইয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া পান করিতে দিলে বমির উদ্বেগ থামিয়া যায়। স্তনদুগ্ধে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া খাওয়াইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। বরফের ছোট ছোট টুকরা মুখে রাখিতে দিলেও বমির বেগের উপশম ঘটে।

শ্বেতসর্ষে, বচ এবং লোধ বাটিয়া নাভির নীচে যকৃৎস্থানে প্রলেপ দিলে বমন বেগ বন্ধ হয়। আল্‌তা, বাবলা ছাল, আম্‌লা, মউরী, ছোলা, মিশ্রি একসঙ্গে ভিজাইয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া তাহাতে ২।৪ ফোঁটা লেবুর রস মিশাইয়া ২।৩ চামচ করিয়া পান করিতে দিলে পিপাসা ও বমন বেগ উভয়েরই শান্তি হয়।

শূল।

ওলাউঠা রোগে পেটে, তলপেটে এবং নাভিদেশে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। প্রথমত তত্তৎ স্থানে চাপ ধরিয়া সেই চাপ অবিরত সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন বোধ হয়—যেন কেহ এক যোগে সহস্র সহস্র সূচ্যগ্র মুহুর্মুহুঃ ঐ সকল স্থান পীড়ন করিতেছে এবং বক্ষ, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি স্থান যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহা বিষম যন্ত্রণাপ্রদ। শরীরস্থ শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলাশয়ে যাইবার সময় এবং ক্রিমিদোষ জন্য এইরূপ বেদনার উপস্থিতি ঘটে। ইহাকে শূল কহে। পূর্ব্ব কথিত বিসর্পন চূর্ণ যথাসময়ে যথাবিধি সেবন করাইতে পারিলে কাহাকেও এই রোগে বড় বেশী আক্রান্ত হইতে হয় না। পূর্ব্ব সঞ্চিত দোষের প্রকোপ জন্য যদিও কখনও কখনও এই বেদনার সূচনা ঘটে, তাহা হইলেও তাহার উপশমের জন্য বিশেষ কোনও

চেষ্টা করিতে হয় না। প্রায়শঃ আপনা-হইতেই ইহা তিরোহিত হইয়া যায়। ঈদৃশ বেদনা দূর করিবার জন্য অর্দ্ধ তোলা শ্বেত অপামর্গের মূলের রস (আপাঙ্গ) সহ স্ব স্ব পরিমিত হরিতাল ভস্ম বা বিশোধিত শঙ্খবিষ সেবন করিতে দিবে। ২।৩ বার সেবন করাইলেই বেদনা নিবারিত হয়। শোধিত কুঁচিলা ২ রতি এবং কমলাগুঁড়ি ১ আনা—একত্র পেষণ করিয়া এক ছটাক চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। কিছুকাল পরে সেই জল ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে ক্রিমিদোষজনিত বেদনার শান্তি হয়। কচি মূলার রসের সহিত উক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিলেও বেদনা দূরীভূত হয়। শুঁঠ, শ্বেত সর্ষপ, সজিনাছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও এক্ষেত্রে বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তারপিন তৈল মর্দ্দনেও উপকার হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম ও তৃষ্ণা।

রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু একমাত্র ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সপ্ত ধাতু যথাক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে অসার ভাগকে মল এবং সার ভাগকে শরীর পোষক উপাদান কহে। মেদের যে অসার ভাগ, তাহাকে মেদ-মল অথবা ঘর্ম্ম কহে। ইহা রোমকূপ দ্বারাই নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শরীরস্থ যে সকল জলীয়াংশ রোম-কূপদ্বারা নির্গত হয়, আমরা তাহাকেই ঘর্ম্ম বলিয়া থাকি। ওলাউঠা রোগে মলদ্বার দিয়াও ঐ সকল জলীয়াংশ নির্গত হয়। কিন্তু তাহা ঘর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় না। যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, শরীর হইতে জল নিঃসরণ হইতে থাকিলেই প্রথমতঃ অত্যন্ত পিপাসা হয়, শেষে অঙ্গ সমূহ ক্রমশঃ শীতল ও শিথিল হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, শ্রম বা বলক্ষয়াদি—বাত প্রকোপ হেতু দ্বারা অথবা কটু, অম্ল, ক্রোধ ও উপবাসাদি—পিত্তবর্দ্ধক কারণ বশতঃ স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত পিত্ত, বায়ুর সহায়তায় উর্দ্ধপ্রসৃত তালু ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) স্থানে গমন করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোতঃ সমূহ বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিপাসা জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক ঘর্ম্ম ও পিপাসা—এই দুইটি উপদ্রব বড়ই ভয়াবহ। ইহাদিগের দ্বারা শীঘ্রই মোহ উপস্থিত হইয়া জীবনান্ত হইতে পারে। এ অবস্থায় কখনও জল পান করিতে নিষেধ করা উচিত নহে। যদিও অতিরিক্ত মাত্রায় জল পান করিলে প্রকৃত পক্ষে পীড়ার কোন উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইলেও আশু জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে কর্প্‌র বাসিত পরিস্কৃত শীতল জল অথবা বরফ জল দেওয়া সঙ্গত। সেই সঙ্গে হেতু প্রষেধক ঔষধও প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। যাদৃশী শক্তি প্রভাবে শরীর হইতে যে জাতীয় বস্তু নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাদৃশী শক্তি বিশিষ্ট অন্য জাতীয় বস্তু প্রয়োগ না করিলে কখনও সেই নিঃসরণ-ক্রিয়ার রোধ হইতে পারে না।

সুপক্ক নীরস সুপারি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা এবং মোহ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অথবা "ষড়ঙ্গ পানীয়ে"র বিধানানুসারে সুপারির কাথ প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলেও বেশ সুফল

দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রবর্ণ অর্থাৎ কচি কচি আমের পাতা ও কাল জামের পাতার কাথ সেবন করিতে দিলেও পিপাসা উপশমিত হয়। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় সুপারি ভক্ষণ করিলে যে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, শরীরে অস্থিরতা, বুকে পেটে থালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু যাহাতে যে রোগের উৎপত্তি বেশ প্রণিধান পূর্ব্বক সমীচীনতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে সেই সেই দ্রব্যে সেই সেই রোগের তিরোধান ঘটে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ওলাউঠা রোগ সংক্রামক হইলে অনেকে একটি গোটা সুপারি হাতে বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা দ্বারাও সুপারিতে বিসূচিকা দমনের শক্তি অনুধ্যানযোগ্য। অনেক দ্রব্যই বাহ্য এবং অভ্যন্তর প্রয়োগে যুগপৎ বিস্ময়াবহ সুফলের উৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ। *

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী)

মৃতবৎসার মাদুলী।— অপামার্গের শিকড় তাবিজে ভরিয়া শনি অথবা মঙ্গলবারে শুদ্ধ হইয়া ধারণ করিলে মৃতবৎসাদোষ দূর হয়।

রক্ত আমাশয়ে।—বুনো পুঁইপাতা ৪-৫টী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে যে প্রকার রক্ত আমাশয়ই হউক না কেন—নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

শ্বাসে।—আফুলা দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়া) শিকড় ১০টা, মরিচ ২১টা প্রাতঃস্নান করতঃ যথাশক্তি গরম জলসহ উক্ত ঔষধ খাইতে হইবে এবং তৎপর গরম কাপড় দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করতঃ ৩ ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে ৭ দিন করিলে প্রবল শ্বাস দূর হয়।

উপদংশে।—শ্বেত করবির মূল ঘসা

---

* বরেন্দ্রভূমিতে স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার চিকিৎসার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদিবার লোক এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। কীর্ত্তিমান্ কুশলী কবিরাজ অনেকেই ছিলেন, এখনও অনেকেই আছেন। স্বর্গীয় মহাত্মা কবিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের বৈশিষ্ট প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ লইয়া লোকে যাহাকে বলে "শুধু হাতে বাঘ মারা", যাঁহার অনণ্য সাধারণ কার্য্য প্রণালী ঠিক তদ্রূপই ছিল। চিকিৎসার্থ যেখানেই আহূত হইতেন না কেন, তাঁহার প্রযোজ্য ঔষধের কুত্রাপি অভাব হইত না। তাই আজ আমরা তাঁহার অমোঘ মুষ্টিযোগ ও ঔষধাবলী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বারান্তরে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের বিচিত্রতাপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ অলোকসামান্য জীবন-আখ্যায়িকা লিখিতেও প্রয়াসী হইব। ইনি শুধু প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ ছিলেন না,যোগের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়াও অনেকের ধারণা ইঁহার উপর অতি অধিক মাত্রায় ছিল।—লেখক।

১ তোলা রক্তচন্দন ঘসা ১ তোলা, একত্র মিশাইয়া ৭টী বটীকা প্রস্তত করিতে হইবে। ঐ বটিকা ১টী করিয়া প্রত্যহ প্রাতে নিম্বপত্র ও গুলঞ্চের রস সহ সেব্য।

নাসা ও রক্তপিত্তে।—ছাগদুগ্ধ ।৵৹ পোয়া, (একপোয়া) রক্তচন্দন ঘসা, মধু, গব্য-ঘৃত ও চিনি প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞডুমুরের রস সহ সেব্য।

স্বপ্নদোষে।—আফিং ৵৹ আনা (এক আনা) রসসিন্দুর।৹ আনা (চারি আনা) শীতল জল সহ উক্ত ঔষধ মর্দ্দন করিয়া একটি সর্ষপ অপেক্ষা সামান্য মাত্র একটু বড় করিয়া বটি প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ বটী রাত্রে গরম দুগ্ধ ২ তোলা সহ সেব্য।

প্রমেহে।—কচিশিমুল মূলের ছাল ।৵৹ পোয়া, কলমী সোরা ৵৹ ছটাক, চন্দনের বীজ ১ তোলা শ্বেতচন্দন ঘসা ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। কচি শিমুল মূলের রস ২ তোলা মধু ও কাবাব চিনির চূর্ণ সহ প্রাতে ও বৈকালে এক এক বটিকা সেব্য।

ঘায়ে।—ঘায়ে—তিল তৈল ।৹ পোয়া, বিশুদ্ধ মোম ৵৹ ছটাক কুচিলা অর্দ্ধ তোলা, নিমপাতা বাটা ১ তোলা, শ্বেতধুনা অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশাইয়া একটি মৃতপাত্রে রাখিতে হইবে। এই ঔষধ যে প্রকার ক্ষত হউক না কেন, মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:—

দান।—গয়ার গোস্বামী রামধন পুরী মহাশয় কিছুদিন হইল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা-লয় পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া ইহার উন্নতি কল্পে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদ।—ইনফুয়েঞ্জার প্রকোপ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশেও ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ খুব কম দাড়াইয়াছে। করাচী ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোনো কোনো স্থানে ইহার আক্রমণের গতি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতার মৃত্যু-হিসাব।—কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা গত বৎসর যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১৯০৭ সালের পর হইতে আর যেরূপ দেখা যায় নাই। গত বৎসর কলিকাতা সহরে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৩১, ৩৭১। এই মৃত্যুর হারের হাজার করা হিসাব ৩৫,০। উহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে কলিকাতার লোক মরিয়াছিল মোট ২১,৩৬০ জন এবং ঐ মৃত্যুর হারের হাজার করা হিসাব হইয়াছিল ২৩৮। এই হিসাবে বুঝা যায় ১৯১৭ সাল অপেক্ষা ১৯১৮ সালে

মোট মৃত্যু সংখ্যা দশ হাজার এবং হাজার করা ১১'২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি কিরূপ ঘটিতেছে, তাহা এই মৃত্যুর হিসাব হইতেই উপলব্ধি হইতে পারে!

দিল্লীর হাকিম।—কয়েকদিন হইল দিল্লীর স্বনামখ্যাত হাকিম হাজিমুল আজমল খান এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর এবং ডাক্তার বি, কে, মিত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। হাকিম সাহেব এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর দিল্লীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের জন্য চাঁদা তুলিতে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখানে আড়াই লক্ষ টাকা তুলিয়া ফিরিবার সময় কলিকাতার পথে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীর এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হাকিম বাহাদুরেরই প্রভূত চেষ্টার ফলপ্রসূত। লর্ড হার্ডিংজের যত্নে একলক্ষ টাকা পাইয়া হাকিম বাহাদুর এই কলেজের উন্নতিকল্পে বদ্ধ পরিকর হন। ব্রহ্মদেশের লোকে দিল্লীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের কল্যাণ-কামনায় চাঁদা দিয়া অবশ্যই ধন্যবাদার্হ কিন্তু কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ কলেজটির উন্নতির জন্য বঙ্গদেশের অধিবাসীগণ কি করিতেছেন?

সদনুষ্ঠান।—গত ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর জেলা দাতব্য সমিতি হইতে জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে তের শত দরিদ্র ও পীড়িত লোককে বস্ত্রদান করা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য বাবু কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তিন শত টাকা সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

চিকিৎসালয়ে দান।—মেদিনীপুরের 'নীহারে' প্রকাশ—কাঁথির প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয় সেখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের মহিলা বিভাগের উন্নতি কল্পে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে ঐ উকীল মহাশয় ঐ উদ্দেশ্যে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

শিশুমৃত্যু।—বিহার ও উড়িষ্যায় যত শিশু জন্মে, উহার তৃতীয়াংশ জন্মের অল্পকাল মধ্যেই মরিয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গদেশে শিশু মৃত্যুর মরণের হিসাব হাজার করা ১৮৫ এবং সমগ্র ভারতে উহার হাজার করা হিসাব ২০৬। বিহার ও উড়িষ্যার হাজার করা হিসাব ১০৮। ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১ জন শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

সমালোচনা।

—:*:—

রোগ নির্ণয় সংগ্রহঃ। প্রথমঃ ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীতঃ প্রকাশিতঞ্চ। ৬৪নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট পওয়া যায়। মূল্য ১৲ টাকা। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি অভিনব ভাবে লিখিত হইয়াছে। এক একটি

প্রধান লক্ষণ কতকগুলি রোগে দেখা যায়, তাহার তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রোগ নির্ণয় প্রণালীর সূচনা ভালই করা হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ রোগনির্ণয় ইহা দ্বারা হইবে কিনা বুঝা গেল না, তবে গ্রন্থকারের উত্তম প্রশংসনীয়। ২য় ভাগে রোগনির্ণয়-প্রণালী প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে না।

দ্রব্যগুণ দর্পণম্। প্রথম ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য ১॥০ টাকা। দ্রব্যগুণ শিক্ষার ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাথমিক গ্রন্থ। দ্রব্যগুণে জ্ঞান না থাকিলে সুচিকিৎসক হওয়া যায় না। চিকিৎসা বিষয়ের প্রথম শিক্ষার্থিগণ যদি এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে চিকিৎসার কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। তবে ২য় ভাগ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

সন্ধি বোধম্। বাঁকুড়ান্তর্বর্ত্তি বিষ্ণুপুর বাস্তব বৈদ্য শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মণা প্রণীতং প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য ॥০ আনা গ্রন্থকার ব্যাকরণের সন্ধিগুলিকে কবিতা করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণের মত নীরস জিনিষকে সরস কবিতায় অনুবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেবল রাঘব ভট্টাচার্য্যের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি পদ্যে শিশুদিগকে ব্যাকরণের সূত্রগুলি অতি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি সূত্র এইরূপ—

"ঋকার রকার ষকার পরে ন কার যদি
থাকে।
কচ্ করি তার কাটি মাথা—কোন বাপে তায়
রাখে।"

এই শ্লোকটির অনুকরণে আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

ঋকার রকার ষকারের পর ন কার থাকে যদি,
মাত্রাটি তার কেটে ফেলে মাথাটা তুলে দি।

রাঘব ভট্টাচার্য্যের—এরূপ অনুকরণ তো এ গ্রন্থে যথেষ্ট আছেই, তা' ছাড়া যেখানে গ্রন্থকারের নিজস্ব সূত্র রচিত হইয়াছে—সেই স্থানেই সেই সূত্র গুলি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ইঁহার নিজস্ব একটি কবিতারও নমুনা দেওয়া গেল,—

অক্ষ শব্দ থাকলে পরে জানালা বুঝালে,
গোএরও অব হয়,—না হয় প্রাগ্যঙ্গ হোলে।

তবে এই গ্রন্থ মধ্যে যে স্তোত্রাবলী লিখিত হইয়াছে, সে গুলি উৎকৃষ্ট। স্তোত্রগুলি যেরূপ সুমধুর ছন্দে লিখিত, সেইরূপ সম্ভাব প্রবণ।

গান। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারি লাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। আদ্যাশক্তি জগন্মাতার আগমনী ও বিজয়া প্রসঙ্গে এই গান বিরচিত, ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীশ্যামার উদ্দেশেও কয়েকটি গান রচিত হইয়াছে। এই গান গুলির রচয়িতা বিহারি বাবু এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক। ভাষার ছটায় এবং ভাবের সম্পদে "বঙ্গবাসী"র এত যে গৌরব—তাহা এখন বিহারিবাবুরই প্রসাদে। "গান" সেই বিহারি বাবুর পরিপক্ক হস্তের অঙ্কিতকীর্ত্তি। শুধু ভাব ও ভাষার কথা নহে, এই গান গুলিতে বিহারি বাবুর অন্তর্নিহিত আবেগ ধারা যেন আকুল হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই গান গুলির প্রত্যেক কথাটিই যেন ভক্ত সাধকের প্রাণের উচ্ছ্বাস। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গান গুলি গীত হউক, কুকর্ম্মনিরত বাঙ্গালী সন্তান আবার মায়ের নামে জাগিয়া উঠুক, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আগমনী ও বিজয়ার গানে সে কালের ধর্ম্মভাব আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

পল্লী-স্বাস্থ্য।*

—:০:—

এমন একদিন ছিল—যে দিন বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিছুরই অভাব ছিল না, দেহ ধারণের সকল সামগ্রীই বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রকৃতি দেবী সযত্নে সাজাইয়া রাখিতেন। নদী বহুলা বলিয়া পল্লীভূমির যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা হইতে পল্লীবাসীর বিশুদ্ধ জলের অভাব হইত না। দেহধারণের জন্য জল, বায়ু ও আলোক—যে তিনটি দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক; বাঙ্গালার সকল পল্লীবাসীই সে তিনটি দ্রব্য বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইত। এখন বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা সকল বহুকালাবধি সংস্কারের-অভাবে পঙ্কিল হইয়াছে, কাজেই অনেক পল্লীতেই এখন জলকষ্ট হইয়াছে। আর বায়ু ও আলোক;—নিদাঘ সন্তপ্ত-পল্লী-কৃষকের অঙ্গে শাল তমাল পত্রের মর্ম্মর বায়ু এখনও প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু পল্লীভূমির চতুঃপার্শ্বস্থ নালা ডোবা বিস্তৃতির ফলে সে বায়ুও যেন এখন কতকটা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিরাণী পল্লীমাতার উদ্দেশে এখনও মার্ত্তণ্ড ময়ূখ এবং হিমাংশু কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবিশুদ্ধ জল বায়ুর নিকট সে কিরণ সম্ভার বিশেষ কার্য্য করিতে পারে না। পল্লী গ্রামে এইজন্যই রোগের জ্বালা এবং তাহা হইতেই বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশান হইতে বসিয়াছে।

কিন্তু এমনটা হইল কেন? কাহার অভিসম্পাতে পল্লীভূমির এরূপ দুর্গতি হইল? ইহার উত্তর দিতে হইলে পল্লীবাসীকেই ইহার কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিব। যে জল—দেহ ধারণের প্রধান জিনিষ,—সে জলের দুর্গতি পল্লীবাসী নিজ হইতেই উপস্থিত করিয়াছে।

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৯ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

স্বীকার করিলাম,—বাঙ্গালার অনেকগুলি নদীর দুর্গতি নানা কারণে হইয়াছে এবং পল্লীভূমির স্থানে স্থানের বায়ুও তজ্জন্য অবিশুদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু সে সেকালের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য একালের পল্লীবাসিগণ কি কোনোরূপ চেষ্টাশীল হইয়াছেন? জল দেহ ধারণের প্রধান সামগ্রী বলিয়া জলের অন্য নাম জীবন। এই জন্যই আমাদের দেশে পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার পালনের জন্য নূতন নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, পূর্ব্বপুরুষ- দিগের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা-পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্যও এখন কয়জন চেষ্টাশীল? আগে পল্লী-জননীর কৃতী সন্তানগণ স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য মনোভিনিবেশ করিতেন। তখনকার দিনে গ্রামে একজন শ্রীমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে, সে গ্রামখানি শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিত। তখনকার দিনে অনেক গ্রামেই দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, রথ হইত, রাস হইত—এক কথায় বাঙ্গালার হিন্দুর পল্লীগুলিতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। অনেকগুলি সমৃদ্ধি সম্পন্ন পল্লীতে বর্ষে বর্ষে বারইয়ারি পূজাও হইত। ইহার ফলে ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্য যাহা হয় হউক,—তা' ছাড়া প্রতিমা বাহির করিবার জন্য গ্রামের রাস্তাঘাট গুলি পরিষ্কার করা হইত, ফলে প্রতি বর্ষেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলা হইত। ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও—স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়াও ইহাতে যে পল্লীগুলির বিশেষ উপকার হইত—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ম্যালেরিয়ার তাড়নে পল্লীমাতার সুসন্তান গণ অধুনা বিদেশবাসী। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিরূপভাবে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইল—সে কথাটি একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি! ম্যালেরিয়া কবে আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের কয়েকজন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। এই ১৮০৪ খৃঃ অব্দ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল। জাতীয় বৃত্তি নিরত-বাঙ্গালীর চাকরি করিবার স্পৃহা এই সময় অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারই ফলে দেশ মাতৃকার সুসন্তানগণ জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে কর্ম্মস্থলে আবাস স্থান নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তখনও বাঙ্গালার জলকষ্ট সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, কিন্তু অনেক পল্লীভূমিই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তবে তখনও সে সকলের পরিণতি খুব বেশী রূপ হয় নাই বলিয়া সে আক্রমণের গতিও অধিক হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার বিশ বৎসর পরে রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্টিত মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া এই দুরন্ত ব্যাধি যখন চিত্রানদীর উভয় পার্শ্ব দিয়া গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ উচ্ছেদ করিতে লাগিল, যখন নলডাঙ্গার মত গ্রাম, গদাখালির মত বাণিজ্য বহুল বন্দর,—তা'রপর নদীয়ার কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, বীরনগর প্রভৃতি গ্রামগুলি বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল,—তখন পল্লীবাসিগণেরও সে কালের চালচলন অনেক বদলাইয়া আসিয়াছে। তখন অনেক পল্লীরই জলাশয়গুলি হাজিয়া মজিয়া উঠিয়াছে, অনেকের নাট মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপে অশ্বত্থ বটের শিকড় গজাইয়াছে, অনেক পতিত

প্রাসাদের গ্রথিত ইষ্টক ভেদ করিয়া কতক গুলি বিটপি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। অনেক পল্লীবাসীই স্বজাতির মায়া পরিত্যাগ করিয়া,—আত্মীয় স্বজনের প্রীতি-সখ্যতা বিসর্জ্জন দিয়া,—দরিদ্র প্রতিবাসীর আগ্রহ আকাঙ্খা ভুলিয়া গিয়া,—পল্লীমাতার অঙ্ক ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে অনেক পল্লীতেই জলকষ্ট হইল, পূতিগন্ধময় স্বল্পতোয়া পঙ্কিল ডোবার মধ্যে ম্যালেরিয়ার সজীব জীবাণুবাহীদল পুষ্টি পাইতে লাগিল, জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলি তাহাদের বিহারভূমি হইল, ফলে যাহারা পল্লীজননীর অঙ্ক পরিত্যাগ করিল না, তাহারা ঐ সকল মশকাক্রামণে সহজেই ম্যালেরিয়ার কালকবলে পতিত হইতে লাগিল,—এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিল।

পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিল,—কিন্তু পল্লীর কৃতীপুরুষগণ সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিয়াই বা কি সুখ পাইলেন? সহরে আসিয়া সহর প্রবাসিগণ কলের জল পাইলেন, গ্যাস বিদ্যুতের আলোক পাইলেন, সাধ মিটাইবার, সখ পূরণ করিবার—সভ্য হইবার সকল উপকরণই পাইলেন, কিন্তু সহরের জনসঙ্ঘে সহরের বাষ্প রাশি বদ্ধ হইরা পড়িল, একটির পর আর একটি সৌধ, তাহার পার্শ্বে আর একটি সৌধ, সেই ধবল শুভ্র সৌধপ্রান্তে আবার সৌধ,—পার্শ্বে সৌধ, পশ্চাতে সৌধ, সম্মুখে সৌধ,—কাজেই সহরের সেই সৌধ শিখর ভেদ করিয়া মার্ত্তণ্ড দেব আর ময়ুখমালা বিস্তারে সমর্থ হইলেননা,—পূর্ণিমার চন্দ্র দূরে—অতি দূরে—অন্তরালে থাকিয়াই হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন,—বায়ু বদ্ধ—আলোকের অভাব—কাজেই সহরের সহজ সুলভ কলের জলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পীড়িত পল্লী পরিতক্ত সহর প্রবাসীর স্বাস্থ্যসুখ উপলব্ধির সুযোগ ঘটিল না, ফলে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে সহরের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিল,—কলেরা-রাক্ষসী তাণ্ডব লীলা করিতে লাগিল,—ক্রমে প্লেগ জুটিল,—ফুস ফুসের পীড়া বৃদ্ধি পাইল,—মিউনিসিপ্যালিটির কৃপায় সহর প্রবাসীর সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা যত উত্তমরূপেই করা হউক, সহরপ্রবাসী কিন্তু রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না, কাজেই ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িলেও পল্লী ভূমির চাকরিগত প্রাণ কর্ম্মঠ পুরুষগণ সহরে আসিয়াও সুখী হইতে পারিল না।

সুখী হইতে পারিবে কিসে? সুখী হইতে হইলে সকল বিষয় অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য সুখ অন্বেষণ করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সুখ অন্বেষণ করিতে হইলে যে সকল পুষ্টিকর আহার্য্যের প্রয়োজন, পল্লীবাসীকে যে সে সকল বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইয়াছে! দুগ্ধের মত বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর দ্রব্য আর কিছুই নাই, সেইজন্য পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গাভীপালনের যে ব্যবস্থা ছিল, সহরে আসিয়া নানা কারণে সে ব্যবস্থা রহিত করিতে হইল। দুগ্ধ ঘৃত বিসর্জ্জন দিয়া, অখাদ্য—কুখাদ্য—অমিত—অহিত সহরপ্রবাসী পল্লী পরিত্যক্ত পুরুষগণ স্বচ্ছন্দ মনে ক্রমশঃ উদরস্থ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। শরীর শুদ্ধির জন্য—সাধারণতঃ বায়ু ও পিত্ত প্রধান বাঙ্গালীর ঐ দুইটি ধাতুর সাম্যভাব রক্ষার জন্য পল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যে প্রাতঃস্নানের প্রথা ছিল, সহরে আসার পর হইতে সে প্রথা লুপ্ত হইল। তাহার পর—পূজা আহ্নিকে চিত্তশুদ্ধির পর, আদা, ছোলাভিজা, গুড়, চিনি,—মুড়ি—

নারিকেল—যাঁহার যাহা জুটিত তিনি তাহাই খাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের যে প্রতীক্ষা করিতেন, তাহারও পরিবর্ত্তন হইল,—এক কথায় আহার বিহার—বেশ-বিন্যাস—চাল-চলন—সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-পল্লীবাসীর সহরে আসিয়া সকলই নূতন হইল। ফলে বাঙ্গালীর ধাতুতে এ পরিবর্ত্তন সহ্য হইল না, সেইজন্য ম্যালেরিয়ার আকরভূমি-পল্লী পরিত্যাগেও বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যই যেরূপ দুর্ম্মূল্য—তদুপরি কলিকাতার বাড়ী ভাড়ার হার যেরূপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনেক স্বল্প আয়ের বাঙ্গালী শ্রমজীবির কলিকাতা বাসের স্পৃহাও যেরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট স্বাস্থ্য সুখের আশা যে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া—থাকিবে, এ কথাও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ আমরা বরাবরই বলিতেছি,—আলোক, রৌদ্র এবং বায়ুই মনুষ্যের স্বাস্থ্য সুখের প্রধান উপকরণ। স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় প্রাসাদ লইয়া বাস করা চলেনা, কাজেই অধিকাংশ পল্লী-বাসী যেরূপ বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আলোক-রৌদ্র-বায়ু—তাহাদের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই একে দুগ্ধ ঘৃতের মত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, তাহার উপর কদর্য্য স্থানে বাসের জন্য বাঙ্গালীর পরমায়ু যে ক্রমশঃই স্বল্প হইয়া আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

সেই জন্য আমাদের মনে হয়, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের পতিত ভিটা গুলির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া—সেই সকল ভিটায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়া—পল্লীর সৌম্য-স্তিমিত শান্ত অঙ্কে আবার স্থান লাভের ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-সুখ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। পল্লী-ভূমি ম্যালেরিয়া পীড়িতা, কিন্তু দেশ মাতৃকাকে সে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? আমরা সকল বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকি, কিন্তু অত পরনির্ভরতা কেন? আমরা নিজেদের কি সামর্থ্য অনুযায়ী কিছুই করিতে পারিনা! গবর্ণমেণ্ট—পল্লীবাসীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার জন্য—আমরা না বলিলেও চেষ্টা করিয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লী সন্তান দিগকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট প্রয়াস আছে। কিন্তু সেই প্রয়াসের সহিত আমাদের প্রয়াস যদি একত্র হয়,—তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অনেক কমিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সহরের লোক সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সহরের রোগবাহুল্যও হ্রাস পাইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে পল্লীরক্ষা করিতে হইলে, পল্লীবাসী মাত্রেরই স্ব স্ব বসত বাটীর পার্শ্বস্থ বন জঙ্গল গুলি কাটাইতে হইবে, নালা ডোবা গুলি বুঁজাইয়া ফেলিতে হইবে এবং গ্রামের মধ্যে এমন একটী জলাশয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে জলাশয়ের জল পানার্থ ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত না হয়। যে গ্রামে জলাশয় গুলি হাজিয়া মজিয়া আসিয়াছে, সে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া সাধ্যমত সামর্থ্য—মত চাঁদা তুলিয়া—সেই চাঁদার উদ্বৃত্ত অর্থ স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সেই গ্রামের জলসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক গ্রামের মিলিত চেষ্টায়

প্রত্যেক পল্লীবাসী যদি ঐ কয়টির ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর তিরোধান অসম্ভব হয় না।

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরা—দুইটি প্রবল ব্যাধিরই প্রকোপ দেখা যায় বর্ষার অন্তে। এই বর্ষার অন্তে অনেক পল্লীর একমাত্র জলাশয়েই আমরা জানি—পাট পচান হইয়া থাকে। ফলে এই দূষিত জল পান করিয়া অনেক পল্লীর অধিবাসীই ঐ দুইটি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, পল্লীরক্ষার জন্য প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসীকে ইহার উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম হইতে ইহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু শুধু বচনে কার্য্য হইবে না, পল্লীর কৃতী পুরুষগণ—যাঁহারা সহরে থাকিয়া সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পল্লী-ভিটায় ফিরিয়া গিয়া এই সকল কার্য্যের জন্য অগ্রণী হইতে হইবে—তবে বচন—কার্য্যে পরিণত হইবে।

অবশ্য সহর ছাড়িয়া—সহরের অর্থাগমের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া—একেবারে পল্লী ভূমিতে অবস্থিতির ব্যবস্থা করুন—এরূপ কথা আমি বলিতেছিনা। আমার বক্তব্য—পল্লীর কৃতী সন্তানগণ একেবারে স্বদেশ পরিত্যাগ না করিয়া বৎসরের মধ্যে ২।৩ বারও গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, যে সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পল্লী হইতে হ্রাস পাইয়া থাকে, সেই সময় কয়েক মাসের জন্যও পুত্র কলত্রদিগকে বাস্তুভিটায় সন্ধ্যা দানের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিন,—এরূপ করিতে পারিলেই অধঃপতিত পল্লী শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে, পল্লীর দুর্গতি নিবারণের জন্য আপনা হইতেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও যাহারা বাস্তভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই—তাহাদের মহদুপকার সাধন করা হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদে দেবনির্ম্মাল্য লাভ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জনের পথও পরিষ্কার করা হইবে।

আমার আজি আর বেশী কিছু বলিবার নাই। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অনেকেই আজি লক্ষ্মীর বর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অনেকে সহরে আবাস স্থানও নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন,—কিন্তু লোক সমাজে বাসস্থানের পরিচয় দিতে হইলে—সকলেই পৈত্রিক পল্লী-ভূমিরই নামোল্লেখে গর্ব্ব সুখ অনুভব করিয়া থাকেন,—কিন্তু সেই গৌরবের স্থল জন্মভূমি যে আজি সর্ব্ব প্রকারে দীন ভাবাপন্ন,—সেই পল্লীজননীর আমাদের যে সকল ভ্রাতৃবৃন্দ এখনও পল্লী রক্ষা করিতেছে,—তাহাদের রোগজীর্ণ শরীর, কঙ্কালসার আকৃতি, কোটরা-গত চক্ষু—পল্লী ভূমির স্বাস্থ্য-দৈন্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যে পল্লীভূমির সন্তান দিগের একদা মনে সুখ ছিল, হৃদয়ে বল ছিল, কার্য্যে উৎসাহ ছিল,—যে পল্লী-প্রান্তে একদিন সেকরার দোকান, কামারের কারখানা, ছুতারের কারুকার্য্যের আলয়—তাঁতীর বস্ত্র বয়নের কক্ষ—সকলই নির্দ্দিষ্ট ছিল,—যে পল্লীপ্রান্তরে একদিন গোচারণের মাঠ ছিল, সহজ সুলভ শ্যামল শস্প সম্ভারে গোকুল আকুল হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিত—তাহার ফলে এখনকার মত গাভীর দল জীর্ণ শীর্ণ হইত না, হৃষ্টপুষ্ট বৃষ মিথুন এবং পয়স্বিনী গাভীর দল সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইত,

যে পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান্য থাকিত, মরাই ভরা শস্য থাকিত, ক্ষেত্র ভরা ফসল থাকিত, যে পল্লীভূমির ঘরে ঘরে একদিন বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, কালীপূজা হইত, জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, পৌষ পার্ব্বণ হইত, রথের ঘটা হইত,—সকলই হইত, মহিলা কুলের কলহাস্য ও অলঙ্কার সিঞ্জন যে পল্লী-পুষ্করিণীর সোপান তলে একদা মধুর স্বরে ধ্বনিত হইত, উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ভুলিয়া—নাপিত খুড়া ধোপা মামা, তাঁতি কাকা প্রভৃতি সম্বন্ধে একদিন যে পল্লীমাতার সন্তানগণের মধ্যে আত্মীয়তা ও সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইত, কালীসর্দ্দার, ভুলু কাহার প্রভৃতি খেলোয়াড় ও লাঠিয়ালের দলের বিচিত্র ব্যায়ামে যে পল্লীবাসী একদিন অপার আনন্দ অনুভব করিত,—পল্লিপরিত্যক্ত সমবেত সভ্যমণ্ডলি! সেই জননী জন্মভূমি পল্লীর প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা একবার চিন্তা করুন! চিন্তা করুন—আমরা সহরে আসিয়া সুখী হইয়াছি,—কিন্তু তখনও বড় কম সুখী ছিলাম না। সে "আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু" আমরা পল্লী ছাড়িয়াই যে বিসর্জ্জন দিয়াছি, ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্য আবার বলিতেছি—পল্লীর ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য পল্লীর প্রত্যেক কৃতী সন্তানই বদ্ধপরিকর হউন,—সারাজীবন সহরের কুহকে ভুলিয়া না থাকিয়া, মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ পল্লীভিটায় শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা করুন—সহরের স্বোপার্জ্জিত ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার নাম দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে,—অক্ষত স্বাস্থ্যে বাঙ্গালীর বলোদীপ্ত প্রতিভা আবার ফুটিয়া উঠিবে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:০:—

বিবিধ সংগ্রহ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

অজীর্ণ মঞ্জরী—কোন্ দ্রব্য সেবন জনিত অজীর্ণ কোন্ দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হয়, এই গ্রন্থে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অঞ্জননিদান—অগ্নিবেশ প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিদান সংগ্রহ। জয়কৃষ্ণ মিশ্র অঞ্জন নিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অঞ্জন নিদান চরকবক্তা অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অনুপান দর্পণ—এই গ্রন্থে ধাতু-

ঘটিত ঔষধ সমূহের প্রস্তুত প্রণালী এবং রোগ-ভেদে ঔষধের অনুপান সমূহ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অনুপানমঞ্জরী— অনুপান-দর্পণের সদৃশ আধুনিক গ্রন্থ। কাশীতে মুদ্রিত।

অনুভূত যোগাবলী—এই গ্রন্থে উত্তম উত্তম পরীক্ষিত যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অভিনব চিন্তামণি—চক্রপাণি দত্ত কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

অর্ক প্রকাশ—রাবণ-কৃত। ইহাতে অর্ক (আরক) প্রস্তুতের নিয়ম এবং রোগ ভেদে প্রয়োগের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। রাবণকৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৌদ্ধ-যুগের পরবর্ত্তিকালে রচিত।

আতঙ্ক দর্পণ—বাচস্পতি কৃত মাধব নিদানের টীকা, গ্রন্থবিশেষ নহে। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন এইজন্য এখানে উল্লিখিত হইল *। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

আদিশাস্ত্র—ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, কিরূপ স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত এবং বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আনন্দ কন্দ—এই গ্রন্থ রসানন্দ কন্দ নামেও প্রসিদ্ধ। মন্থানভৈরব ইহার রচয়িতা। (দ)

আয়ুর্ব্বেদ-সুধানিধি—সায়নাচার্য্যের অনুরোধে একাম্রনাথ অবধান সরস্বতীর পুত্র শৈলনাথ কর্ত্তৃক রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ।

আয়ুর্ব্বেদ সুষেণ সংহিতা—ইহাতে সামান্য ওষধিবর্গ, ধান্যবর্গ, জলবর্গ ইত্যাদির দোষগুণ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ সূত্র—ব্যাকরণের যেমন এক একটী সূত্র থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ সূত্রাত্মক ; সূত্র যথা "আমং হি সর্ব্বরোগাণাং" "অনামপালনং কার্য্যং" ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের অগস্ত্য বিরচিত টীকা আছে শুনা যায় এবং নিত্যানন্দ নাথ বিরচিত প্রশ্নপঞ্চকের টীকা পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থের সপ্তদশ প্রশ্নাত্মক অংশ বিদ্যমান। (দ)

আয়ুর্ব্বেদাগমন—ইহা আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস। ব্রহ্মা হইতে গ্রন্থকার পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারগণের নাম ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুর্ল্লভ।

আরোগ্য চিন্তামণি—চিকিৎসা সংগ্রহ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

ইন্দ্রকোষ—প্রভাকরপুত্র ভট্ট রামচন্দ্র গৌড়ের রাজা ইন্দ্রসিংহের আদেশ অনুসারে নানা বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই কোষ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য নাম "রাজেন্দ্র কোষ"।

উপবন বিনোদ—শার্ঙ্গধর-সংগ্রহের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়াত্মক অংশ। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ভাবে অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কি নিয়মে বৃক্ষ রোপণ

* টীকা গ্রন্থ অসংখ্য—তাহাদের উল্লেখ বিশেষ কারণ না থাকিলে করা হইবে না।

(দ) 'দ' চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ বুঝিতে হইবে।

করিতে হয়, কি উপায়ে বৃক্ষ সকল বৃহৎ এবং প্রচুর ফল ধারণ করে, কোন্ বৃক্ষে কিরূপ সার দিতে হয়, কি করিয়া বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় ও কূপার্থ ভূমি পরীক্ষা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি লিখিত আছে।

ওষধি কল্প—এই গ্রন্থে বিবিধ দ্রব্যের গুণ, কেশরঞ্জন বিধি ও ধাতু জারণমারণের বিধি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

কল্প পঞ্চক প্রয়োগ—এই গ্রন্থে চোপচিনি কল্প, রুদ্রবন্তী কল্প, রাগদমনী কল্প, শিবলিঙ্গী কল্প এবং পলাশ কল্প—এই কয়টী বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কল্যাণ কারক—শ্রীমদ্ জিন মগধ ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে রাষ্ট্রকূট বংশজ মহারাজ নৃপতুঙ্গ মহীবল্লভের চিকিৎসক উগ্রাদিত্যাচার্য্য উহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। উগ্রাদিত্যাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮১৪ বৎসরে নৃপতুঙ্গের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। (দ)

কাম কুতূহল—ইহাতে ধাতুক্ষীণতাদির প্রশমক উত্তম বাজীকরণ ঔষধ সকল লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কামরত্ন—নিত্যনাথ কৃত বাজীকরণ-সংগ্রহ। বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কার্ম্মণম্—এই গ্রন্থে ওষধি সমূহের পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও পত্র এই পঞ্চাঙ্গের গুণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে আন্ধ্রদেশীয় ভেষজের গুণ লিপিবদ্ধ করায় তিনি আন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। (দ)

কালজ্ঞান—শম্ভুনাথ কর্ত্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে মৃত্যুবোধক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

কুট মুদ্গর—এই গ্রন্থে অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা ও পথ্য লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

ক্ষেমকুতূহল—কৃষ্ণশর্ম্মবিরচিত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

গূঢ়বোধক—হেরম্ব সেন কৃত। এই গ্রন্থে কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। অমুদ্রিত।

গৌরী কাঞ্চলিকা তন্ত্র—ইহা তান্ত্রিক চিকিৎসা-সংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

চক্রদত্ত—চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত কৃত নানাস্থানে মুদ্রিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। চক্রদত্ত নামেই সুপরিচিত এই উৎকৃষ্ট সংগ্রহ সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রহের অনেক অংশ বৃন্দ কৃত সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত। চক্রপাণির সময়াদি পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

চর্য্যাচন্দ্রোদয়—ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চারুচর্য্যা—ভোজরাজ কৃত। স্বস্থবৃত্ত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

চিকিৎসা কলিকা—ত্রিসটাচার্য্য কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বিজয়রক্ষিত নিদান টীকায়

ত্রিসটাচার্য্যের রচনা উদ্ধৃত করায় জানা যায় যে,ইনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। চিকিৎসাকলিকা মুদ্রিত হয় নাই।

চিকিৎসা-কল্পলতিকা— ইহাও ত্রিসটাচার্য্য প্রণীত বৃহত্তর চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

চিকিৎসাঞ্জন—ইহাতে জ্বর, শ্বাস, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বঙ্গে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চিকিৎসা দীপিকা—হরানন্দ কৃত। হস্ত লিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসামৃত—গণেশ কৃত। অমুদ্রিত।

চিকিৎসা রত্ন—জগন্নাথ দত্ত কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসা-রত্নাভরণ—সদানন্দ দাধীচ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থ।

চিকিৎসা সার—হরিভারতী কৃত। অমুদ্রিত।

চিন্তামণি—বল্লভেন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় এবং রোগ সমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মবিপাক-জাত রোগ সকল এবং তাহাদের শান্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। চরকাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষয়নির্ণয়, সন্নিপাত-জ্বরাদির ভেদ, সাধ্যাসাধ্য অবস্থা প্রভৃতি এবং রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

জ্বরতিমির নাশক— সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

জ্বরনির্ণয়—নারায়ণ কৃত। অমুদ্রিত।

ত্রিশতী—রাওল শার্ঙ্গধর কৃত জ্বর-চিকিৎসা সংগ্রহ। এই শার্ঙ্গধর সংহিতা-প্রণেতা—শার্ঙ্গধর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

ধারাকল্প—জল ও ক্বাথাদি পরিষেক দ্বারা চিকিৎসাপদ্ধতি মূলক গ্রন্থ। হাইড্রোপ্যাথি (Hydropathy) নামক চিকিৎসায় যেমন জল প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইরূপ জল এবং ক্বাথের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপদেশ আছে।

নপুংসকামৃতার্ণব—এই গ্রন্থে নপুংসক-দিগের জন্য নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, লেপ, বাজীকরণ ঔষধ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান তরঙ্গিনী—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান দীধিতি—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীদর্পণ—নাড়ী জ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

নাড়ী পরীক্ষা—রাবণ কৃত উত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বম্বে নগরে নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাড়ী পরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন—সঞ্জীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণি শর্ম্মার রচিত নাড়ীজ্ঞান ও তন্মূলক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নাড়ীপ্রকাশ—বঙ্গদেশীয় শঙ্কর সেন কৃত নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীবিজ্ঞান—কণাদ কৃত। এই কণাদ বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। মহর্ষি কণাদ চরকের (সম্ভবতঃ অগ্নিবেশেরও) পূর্ব্ববর্ত্তী, কেননা চরকে বৈশেষিকদর্শনের পদার্থবাদ গৃহীত হইয়াছে। কণাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান চরকের সময়ে প্রসিদ্ধ থাকিলে চরকের ন্যায় সর্ব্বার্থসংগ্রাহক মহাগ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের উল্লেখ থাকিত,*। তাহা যখন নাই এবং রচনাও যখন আধুনিক রচনার মত, তখন নাড়ীবিজ্ঞান মহর্ষি কণাদকৃত—একথা স্বীকার করা যায় না।

নাবনীতক—ইহা অজ্ঞাতনামা কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু কৃত সিদ্ধযোগ-সংগ্রহ। কর্ণেল বাউয়ার কর্ত্তৃক চীনদেশে মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত।

নামসাগর—কেন্দ্রদেব কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিদান প্রদীপ—ইহা নাগনাথ বিরচিত রোগ-পরিচায়ক গ্রন্থ। (দ)

নৃসিংহোদয়—বীরসিংহ কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

পথ্যাপথ্য—কেবলপ্রসাদ মিশ্র সংগৃহীত। ইহাতে রোগ ভেদে পথ্যাপথ্যের বিষয় লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

পথ্যাপথ্য-বিনিশ্চয়—বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই বিশ্বনাথ উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক ছিলেন।

পথ্যাপথ্য বিবোধক—কেয়দেব কৃত নিঘণ্ট গ্রন্থ। (বা)†

পরহিত সংহিতা—শ্রীনাথ পণ্ডিত বিরচিত এই গ্রন্থে কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শল্যশালাক্যাদি আটটী তন্ত্র—হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সহ সুবিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। (দ)

পাক প্রদীপ—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পাকরত্নাকর—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পূজ্যপাদীয়—আচার্য্য পূজ্যপাদ এই সংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা। পার্শ্ব পণ্ডিতের লিখিত পূজ্যপাদ চরিত হইতে জানা যায় যে, তিনি ৪৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (দ)

প্রয়োগ চিন্তামণি—রামমাণিক্য সেন রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ।

প্রয়োগ-পারিজাত—অসংখ্য প্রয়োগ-

* বৈদিক গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য বৈদিকযুগে নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষায় নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের নাড়ী (Nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যকের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ভবিষ্যতে নাড়ীপরিচয় বিদ্যার প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। লেখক।

† (বা) এইরূপ চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সম্পাদক পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সমন্বিত প্রাচীন ও প্রামাণিক চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বসবরাজীয়—আন্ধ্রদেশের শৈব ব্রাহ্মণ-কুলে জাত বসবরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষাদ্বারা রোগ নির্ণয়, জ্বর কাসাদি রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং অনুভবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রেউচিনি, অহিফেন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশ পরিগৃহীত ঔষধের উল্লেখও এই গ্রন্থে দেখা যায়। (দ)

বাণীকরী—বাণীকরী রচিত। ইহাতে রোগ সমূহের পৃথক্ করণ (Diagnosis) সম্বন্ধে উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

বালচিকিৎসা পটল—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত শিশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বালতন্ত্র—মহীধরের পুত্র কল্যাণ বৈদ্য কর্ত্তৃক রচিত শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থ। বম্বেনগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বালবোধ—বামাচার্য্য কৃত সরল চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বিশ্বকোষ—মহেশ্বর রচিত বৈদ্যক অভিধান। মুদ্রিত হয় নাই।

বিষোদ্ধার—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লিখিত বিষ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বীরসিংহাবলোকন—বীরসিংহ রচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যক রহস্য—বংশীধরের পুত্র বিদ্যাপতি এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার গৌড়বর্য্য স্থানতি (?) রায়ের অনুমতি অনুসারে ১৭৩৮ সংবতে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে, বিদ্যাপতির সময়ে ফিরঙ্গ রোগ দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বৈদ্য কল্পদ্রুম—শুকদেব সংগৃহীত চিকিৎসাগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যকসংগ্রহ—গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র—এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার চূর্ণ, কাথ, তৈল, ঘৃত এবং পারদঘটিত ঔষধ সমূহের প্রয়োগ-বিধি লিখিত আছে। গ্রন্থে আত্রেয়, চরক, শ্রীবৎস, অমৃতমালা রসার্ণব, রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

বৈদ্যজীবন—দিবাকরসুত লোলিম্বরাজ রচিত। ইহাতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ—দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে আদিরসাত্মক পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যবল্লভ—হিতরুচির পুত্র হস্তিরুচি এই জ্বর চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যবিনোদ—শঙ্কর সেন বিরচিত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যবিলাস—রাঘব কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যমন-উৎসব—বম্বে নগরে মুদ্রিত যোগ-সংগ্রহ।

বৈদ্য মনোরমা—কেরল দেশবাসী শ্রীকালিদাস বৈদ্য রচিত সংগ্রহগ্রন্থ।

বৈদ্যরত্ন—বম্বে নগরে মুদ্রিত চিকিৎসা-গ্রন্থ। গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট এই চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা।

বৈদ্য সঞ্জীবনী—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্য সর্ব্বস্ব—অমুদ্রিত চিকিৎসা সংগ্রহ।

বৈদ্য সংক্ষিপ্তসার—সোমনাথ মহাপাত্র কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্য সংগ্রহ—গোপাল দাস কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—বৈদ্য শ্রীমাণিক্য ভট্টের পুত্র ভিষক্ মোরেশ্বর রচিত। ইহাঁর বাসস্থান মহম্মদ নগরে ছিল। ১৫০৫ সংবৎসরে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। চারিটী অলঙ্কার বা অধ্যায়ে সংক্ষেপে রোগ সমূহের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যামৃত লহরী—মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

ভাস্করোদয়—৺গঙ্গাধর কবিরাজ বিরচিত সংক্ষিপ্ত রোগ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিচার গ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়াছে।

ভীমবিনোদ—দামোদর কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা চিকিৎসা ও উত্তর—এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সকল রোগের নিদান ও ও চিকিৎসা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্মত কর্ম্মবিপাক ও রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। রসঘটিত এবং উদ্ভিজ্জঘটিত উভয়বিধ ঔষধেরই প্রয়োগবিধি গ্রন্থে লিখিত আছে।

ভৈষজ্য রত্নাবলী—গোবিন্দ দাশ কৃত প্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ। বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত সমাদৃত।

ভৈষজ্য সারামৃত সংহিতা—উপেন্দ্র মিশ্র প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (বা)

ভোজন কুতূহল—রঘুনাথ কৃত খাদ্য পাক বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মধুমতী—ইহা নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা সংগ্রহ। নরসিংহ দ্রাবিড়নিবাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র এবং রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। প্রবন্ধ লেখকের নিকট অতি প্রাচীন পুঁথি বর্ত্তমান।

মনোরমা—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত জ্বরচিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মাধবনিদান—বঙ্গের বৈদ্য শিরোমণি মাধবকর সংগৃহীত এই "রুগ্বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থ নিদান বা মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ। মাধবনিদান সমস্ত নিদানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ভারতের সকল দেশেই সমাদৃত। ইহার উপর বিজয় রক্ষিত প্রণীত "ব্যাখ্যা মধুকোষ" এবং বাচস্পতি কৃত "আতঙ্ক দর্পণ" নামক টীকাগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। মাধবকরের আবির্ভাবের সময় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মাধব সংহিতা—গ্রন্থ মধ্যে "মাধব বিরচিত" এই পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাধব এবং মাধবকর যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থে প্রথমে রোগের লক্ষণ এবং পরে চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে। রোগের লক্ষণ মাধবনিদানের ঠিক অনুরূপ—কচিৎ রোগের লক্ষণ কিছু অধিক আছে মাত্র। মাধবনিদানের ক্রম অনুসারে জ্বর হইতে বিষনিদান পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, পরে রসায়ন, বাজীকরণ, পঞ্চকর্ম্ম ও পরিভাষা লিখিত হইয়াছে।

মূত্র পরীক্ষা—অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত মূত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মোমহন বিলাস—ক্ষত্রিয় বংশীয়

মোমহন প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। মোমহন পিরোজখাঁর পুত্র মহমুদ সাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১৪৬৭ শকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া স্বগ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, পুরুহুতজাল, সদ্‌যোগিনী মত, বৃন্দ, বঙ্গ, রসার্ণব, চক্র, অশ্বিনীকুমার সংহিতা, নাগার্জ্জুন, রসযোগ মুক্তাবলী, তত্ত্বকণিকা, রাজমার্ত্তণ্ড, আগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, রসরত্নাকর, যোগনিধান ও ক্রিয়াকালগুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

যোগচন্দ্রিকা—লক্ষ্মণাচার্য্যপ্রণীত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগচিন্তামণি—শ্রীচন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য হর্ষকীর্ত্তি সূরি নামক জৈন পণ্ডিত বিরচিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থ মধ্যে আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট, সুশ্রুত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, হারীত ভৃগু, ভেল, বৃন্দ, মাধব কর প্রভৃতির গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

যোগতরঙ্গিণী—দক্ষিণাপথ নিবাসী বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্ট রচিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম বল্লভ, পিতামহের নাম শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্রের নাম শঙ্করভট্ট। এই শঙ্করভট্ট রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিমল্লভট্ট এই গ্রন্থ ব্যতীত শতশ্লোকী, বৃহদ্ যোগতরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় নামক বৈদ্যক গ্রন্থ এবং অলঙ্কার মঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে অশ্বিনীকুমার সংহিতা, চরকাচার্য্য, চর্পটী, আরোগ্যদর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, কলিকা, গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসা কলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিসটাচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজিত, বৃহদাত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধমত, বৌদ্ধসর্ব্বস্ব, ভদ্র শৌনক, ভালুকি তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগপ্রদীপ, রসরত্নপ্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রুগ্বিনিশ্চয়, রসরত্ন, রসপ্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীরসিংহাবলোকন, বসবরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থে ৭৭টী তরঙ্গ বা অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

যোগদীপিকা—চিকিৎসা-সংগ্রহ। রণকেশরী প্রণীত।

যোগরত্নাবলী—শ্রীকণ্ঠ বিরচিতচিকিৎসা-সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগশতক—শ্রীকণ্ঠ দাস কৃত জরাব্যাধিনাশক শতসংখ্যক যোগ সংগ্রহ। মুদ্রিত হয় নাই।

যোগসমুচ্চয়—দাশগণপতি প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগ সংগ্রহ—গ্রন্থকার অজ্ঞাত। উত্তম উত্তম প্রয়োগ সমূহের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ।

যোগ সুধানিধি—জগদীশের পুত্র বন্দি মিশ্র প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থের ষোড়শ প্রকরণের মধ্যে একটী প্রকরণ মাত্র পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পাঠে বুঝা যায় যে, মনুষ্য-চিকিৎসা শেষ করিয়া স্ত্রী-পশুর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। স্ত্রী-পশুদিগের বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় এই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

রসদীপিকা—আনন্দানুভব কৃত। রস চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা)

রসমুক্তাবলী—রস শোধন মারণ ও

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত। (যা)

রসরত্নদীপিকা—রামরাজ প্রণীত সংক্ষিপ্ত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (যা)

রসরাজ শঙ্কর—রস চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রণীত। (যা)

রসাবতার—(১) গ্রন্থকর্ত্তা অজ্ঞাত। রস চিকিৎসা বিষয়ক বিপুল গ্রন্থ। (যা)

রসাবতার—(২) মাণিক্যচন্দ্র জৈন প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা) *

রাজমার্ত্তণ্ড—ভোজরাজ কৃত উত্তম প্রয়োগ সংগ্রহ। এই গ্রন্থ বম্বে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায়" মুদ্রিত হইয়াছে।

শতশ্লোকী—বোপদেব কৃত শতশ্লোকময় ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শরীর নিশ্চয়াধিকার—রামদাস কৃত। গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম পালন হিতকর এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

শালিহোত্রসার সমুচ্চয়— কহ্লন প্রণীত অশ্ব চিকিৎসা গ্রন্থ।

শ্রীকণ্ঠ নিদান—এই গ্রন্থ জীবরক্ষামৃত নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রথমে নাড়ী প্রভৃতি অষ্ট স্থান পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয়ের উপদেশ দিয়া পরে প্রত্যেক রোগের নিদান লক্ষণাদির বিষয় বলা হইয়াছে। সন্নিপাতাদি কতকগুলি রোগের বিজ্ঞানোপায় এই গ্রন্থে মাধবনিদান অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং মাধবনিদান অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

লক্ষণামৃত—কেরল দেশে প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিষ চিকিৎসা গ্রন্থ। সুন্দর ভট্টপাদ প্রণীত।

সন্নিপাত মঞ্জরী—ভবদেব কৃত সন্নিপাত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সদ্বৈদ্যভাবাবলী—জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংজ্ঞা সমুচ্চয়—চতুর্ভুজের পুত্র শিবদত্ত মিশ্র প্রণীত। গ্রন্থে দ্বাদশটি প্রকরণ আছে। যথা—১। দোষ, ধাতু, মর্ম্ম প্রভৃতি। ২। রোগ সমূহের হেতু প্রভৃতি। ৩। দ্রব্য সমূহের গুণ ও বীর্য্যাদি। ৪। লঙ্ঘন প্রভৃতি। ৫। ত্রিফলাদি পারিভাষিক সংজ্ঞা। ৬। দ্রবদ্রব্য বিনির্দ্দেশ। ৭। কৃতান্নবর্গ। ৮। অহিত দ্রব্য। ৯। স্বরসাদি সংজ্ঞা। ১০। পরিমাণ নির্দ্দেশ। ১১। স্নেহ, স্বেদ, ধূম, গণ্ডূষ, কবল, মুখলেপ, মূর্দ্ধলেপ, নেত্রাঞ্জন, পুটপাক প্রভৃতি। ১২। মিশ্রসংজ্ঞা প্রকরণ। ইহা উত্তম সংগ্রহ গ্রন্থ কিন্তু অমুদ্রিত।

সাধ্যরোগরত্নাবলী—শ্যামলাল কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সিদ্ধভেষজ মণিমালা—জয়পুর-বাসী ভট্ট শ্রীকৃষ্ণরাম প্রণীত উত্তম আধুনিক গ্রন্থ।

সিদ্ধান্ত মঞ্জরী—বোপদেব কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

স্ত্রী-চিকিৎসা—বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

স্ত্রীবিলাস—দেবেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রী-চিকিৎসা বিষয়ক নাতিবৃহৎ গ্রন্থ।

* "যা" চিহ্নিত রসগ্রন্থগুলির বিবরণ পরে জানিতে পারায় রসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া বিবিধ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

হংসরাজ নিদান—হংসরাজ কৃত নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

হিতোপদেশ (১)—শ্রীকান্ত দাশ কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। ইহাতে শিশু, স্ত্রী ও বিষ চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

হিতোপদেশ (২)—শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত। (দ)

দক্ষিণাপথের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠন সংস্কৃত ভাষাতেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় আন্ধ্র প্রভৃতি ভাষারও সমধিক উন্নতি হওয়ায় বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ঐ সকল ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা দক্ষিণাপথে সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা "বড়্-সম্প্রদায়" এবং যাঁহারা দ্রাবিড়াদি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা "তেন্ সম্প্রদায়" নামে প্রসিদ্ধ। আন্ধ্র দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রচিত কোন কোন গ্রন্থ দুই সহস্র বৎসর বা তদূর্দ্ধ কালের প্রাচীন। অবশ্য দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে সেই সকল গ্রন্থ যে ভাষাগ্রন্থগুলির মূলীভূত—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক মৌলিক ভাষাগ্রন্থও বর্ত্তমান। আমরা দক্ষিণাপথের যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে তদ্দেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

পুলস্ত্য	জেবিমুস্থ
তেরহ্যর	পের্ব্বাংতোম্বুমুস্থ
প্যহমুনি	তেক্কাটুমুস্থ
ভোগর	আলন্তু রুনম্বি
পুলিপ্পাণি	উগ্রাদিত্যাচার্য্য
বৈথরিমুস্থ	মঙ্গরাজ
শিরট্টনমুস্থ	অভিনব চন্দ্র
তিরুবান্ কুরু	পূজ্যপাদ
হস্তচারি	বসবরাজ
বিশাল	বিজ্ঞানেশ্বর
বিভগুক	গঙ্গাধর
বৈদর্ভনর	মস্থান ভৈরব
বাগলি	মঙ্গরগিরি স্থরী
মৃগশর্ম্ম	শ্রীনাথ পণ্ডিত
সুরেন্দ্র	ত্রিমল্ল ভট্ট
দেবেন্দ্র মুনি	শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত
নংজরাজ	শ্রীকণ্ঠ শিব পণ্ডিত
নৃসিংহভট্ট	নাগনাথ
বল্লভেন্দ্র	

গ্রন্থ।

কার্ম্মণম্	উমামহেশ্বর সংবাদ
অভিধান রত্নমালা	চিন্তামণি
দ্রব্যগুণ রত্নাবলি	বসবরাজীয়
দ্রব্যগুণ কল্পবল্লী	হিতোপদেশ
আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি	যোগরত্নাবলি
পদার্থ চন্দ্রিকা	যোগতরঙ্গিণী

দ্রব্যগুণ চতুঃশ্লোকী	বৃহৎ যোগতরঙ্গিণী
শ্রীকণ্ঠ নিদান	পরহিত সংহিতা
নিদান প্রদীপ	রস প্রদীপিকা (আং)*
নাড়ীজ্ঞান বিনির্ণয়	শিবতত্ত্ব রত্নাকর
ষড়বিধ নাড়ী তন্ত্র	আনন্দ কন্দ
নাড়ী নক্ষত্র মালা	রুগ্-হৃদয়
নাড়ী জ্ঞান	রুগ-বিলাস
ভেষজ সর্ব্বস্ব	রুগ্ হৃদয় সার
ধন্বন্তরি বিলাস	আয়ুর্ব্বেদ সূত্র
যোগ শতক	ভেষজ-কল্প (আং)
সন্নিপাত চন্দ্রিকা	নবনাথ সিদ্ধ দীপিকা (আং)
রাজমৃগাঙ্ক	আন্ধ্র বৈদ্য চিন্তামণি (আং)
প্রশ্নোত্তর রত্নমালা	শতশ্লোকী (আং)
ধন্বন্তরি সারনিধি	আয়ুর্ব্বেদার্থ সংগ্রহ (আং)
বীরভট্টীয়	ধন্বন্তরি বিজয় (আং)
গদ সঞ্জীবনী	ভিষগ্বরাঞ্জন (আং)
বুবরাজীয় (আং)	খগেন্দ্রমণি দর্পণ (আং)
দূতাধ্যায় (আং)	সাহিত্য বৈদ্যবিদ্যা জলনিধি
মদন কামরত্ন (আং)	ভিষগ্বর তিলক
বালগ্রহ চিকিৎসা	কবিজনৈক মিত্র
সর্ব্বরোগ চিকিৎসা রত্ন	পূজ্য পাদায়
চিকিৎসা নুলু (?)	কল্যাণকারক
বাগ্ভট চিন্তামণি	সহস্র যোগ
বৈদ্যসার সংগ্রহ	হরমেখলা
চিকিৎসা সার	আরোগ্য কল্পদ্রুম

• আন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত আরও কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিকিৎসা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত দ্রাবিড় ভাষায় রচিত।

অগস্ত্যার গেরুন্দিরট্ট	সরকুবৈপ্প
অগস্ত্যার ভস্মমূরৈ	রামদেবন পেরিনুল
অগস্ত্যার আয়ুর্ব্বেদ ভাষ্যম্	গোরক্ষর বৈদ্যং
অগস্ত্যার নাড়িমুল	মৎস্যমুনি এন্নর
অগস্ত্যার আম্বিরত্তনেনুর	করুবুবার তিরট্ট
অগস্ত্যার তোলকাপ্যং তেরষ্যম্	করাশীল মুন্নুর
অগস্ত্যার পরিপূর্ণং	
পুলিপ্পাণি ঐনুর	অগস্তর্ পিল্লৈতমিল্
ভোগর এন্নূর্	শিবজালং
উহ্মুনি আয়িরং	যম্মুখ জালং
রোমঋষি ঐনুরু	কোংকণর্ নিদানং

সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—

দক্ষিণাপথ হইতে সিংহলদ্বীপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আনন্দকন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতা মন্তনভৈরব সিদ্ধসিংহলদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। সারার্থসংগ্রহ, ভেষজ-মঞ্জুষা, সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক সারস্বত নিঘণ্ট, সিদ্ধৌষধ নিঘণ্ট এবং যোগ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সিংহলে এখনও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যোগরত্নাকর ছয় শত বৎসরের ও অধিক কাল পূর্ব্বে ময়ুরপাদ ভিক্ষু নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।*

আমরা বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে লিখিত হইল। বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। লিখিত গ্রন্থ সকল ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে বহু গ্রন্থরত্ন অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের উদ্ধার কল্পে সমগ্র ভারতব্যাপী যথোচিত

* "আং" চিহ্নিত পুস্তকগুলি আন্ধ্র ভাষায় রচিত।

* দক্ষিণাপথ ও সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈদ্যরত্ন গোপালাচার্লু মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রযত্ন হয় নাই। যাহাতে দেশের সমস্ত চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণের যত্নে ভারতব্যাপী বিশিষ্ট প্রযত্ন হয় তাহার আয়োজন সম্প্রতি হইতেছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে আয়ুর্ব্বেদের যে বিশেষ অঙ্গপুষ্টি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক "নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন" নামে যে মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের কোন একটী নগরে সেই মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই অধিবেশনের সহিত যে প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু নূতন গ্রন্থ দেখান হয়। সম্মেলনের স্থায়িসমিতি দ্বারা প্রচারিত বিবরণীতে সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় লিখিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে রক্তমোক্ষণ।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রী……………বন্দ্যোপাধ্যায়।)

অসম্পূর্ণ ধাতু বলিয়া বালকদিগের, ক্ষীণ ধাতু বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের, বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কায় ও উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের, তমোবহুল প্রকৃতি বলিয়া রক্ত দর্শনে মূর্চ্ছা জন্মাইবার আশঙ্কায় ভীরুব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায় পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে স্ত্রীসহবাস হেতু কৃশ ব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত মূর্চ্ছা হইবার ভয়ে মদ্যপায়ী ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে পথভ্রমণ হেতু কৃশ ব্যক্তিদিগের, অধিক বায়ু কুপিত হইবায় ভয়ে যাহাদের বমনকরান হইয়াছে তাহাদের ও যাহাদের বিরেচন করান হইয়াছে তাহাদের, বায়ু প্রকোপের ভয়ে আস্থাপিত (যাহাদের আস্থাপন দেওয়া হইয়াছ) ও জাগরণশীল ব্যক্তিদিগের, মন্দ অগ্নি অধিক তর মন্দ হইবার ভয়ে অনুবাসিত (যাহাদের স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে) ব্যক্তিদিগের, প্রধান ধাতুক্ষয় হইয়া প্রাণনষ্ট হইবার ভয়ে অলসপ্রাণ ব্যক্তিদিগের, ক্ষীণধাতু বলিয়া দেহ নাশের ভয়ে ক্ষীণ ও গর্ভিণীদিগের, কাস, শ্বাস ও শোষ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের, ধাতুপুষ্ট হয় না বলিয়া রক্তক্ষয় বশতঃ প্রাণনাশের ভয়ে তাহাদিগের, প্রলাপাদি জন্মিবার ভয়ে জীর্ণ জ্বর রোগীর, অত্যধিক বায়ুপ্রকোপের ভয়ে আক্ষেপক রোগীর, পক্ষাঘাত রোগীর ও উপবাসীদিগের এবং প্রাণনাশের আশঙ্কায় মূৰ্চ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তিদিগের শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। বিদ্ধ করিলে যে সকল উপদ্রবের আশঙ্কায় বিদ্ধ করা উচিত নহে বলা হইয়াছে, সেই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

শিরা অবেধ্য হইলে, অথবা যে শিরা বিদ্ধ করিবার যোগ্য তাহা দেখা না যাইলে, দেখা গেলেও যদি যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করা না যায়, বন্ধন করিলেও যদি শিরা উন্নত না হয়, তাহা হইলেও শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যাধিতে রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—সেই সমস্ত ব্যাধিতে এবং যে সকল ব্যধির বিষয় পূর্ব্বে কথিত হয় নাই অর্থাৎ অপক্ক ব্রণ প্রভৃতি ব্যাধিতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

কিন্তু যাহাদের শিরা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ, তাহাদের বিষ জনিত উপসর্গে অর্থাৎ সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে এবং বিদ্রধি প্রভৃতি অন্য উপায়ে অসাধ্য ব্যাধিতে প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে শিরা বিদ্ধ করা যাইতে পারে।

রোগীকে স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধ এবং স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া রক্তের উৎক্লেদ জন্মাইবার জন্য তরল খাদ্য বা যবাগূ পান করাইবে। অনন্তর যথাকালে (অর্থাৎ যে ঋতুতে এবং যেরূপ সময়ে শিরা বিদ্ধ করা হিতকর) রোগীকে উপবেশন করাইয়া, যন্ত্র, পাট, চর্ম্ম, গাছের ছাল, লতা দ্বারা যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে সেই শিরা মস্তকে অত্যন্ত গাঢ় না হয়—এরূপ ভাবে এবং হস্ত পদে অত্যন্ত শিথিল না হয়—এরূপভাবে বদ্ধ করিয়া উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে।

অত্যন্ত শীতের সময়, অত্যন্ত গরমের সময়, প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। রোগ না থাকিলে কদাচ শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

যে রোগীর শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হস্ত প্রমাণ উচ্চ আসনে উপবেশন করাইবে। অনন্তর পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া জানুসন্ধিদ্বয়ের উপরে দুই হস্তের দুই কনুই রাখিতে হইবে এবং দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঘাড়ের পিছন দিকে সংলগ্ন করিবে। বন্ধন রজ্জুর অর্থাৎ যে রজ্জু দ্বারা শিরা বন্ধন করা হয়—তাহার দুই মুখ গ্রীবাস্থিত মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া পশ্চাৎভাগ হইতে অন্য ব্যক্তি উত্তান বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেধ্য শিরা উত্থাপিত করিবে। এই সময় রোগী মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকিবে এবং যাহাতে সম্যক রক্তস্রাব হয় তজ্জন্য পশ্চাৎভাগস্থিত ব্যক্তি রজ্জু ধরিয়া টানিবে ও রোগীর পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবে। মুখ ব্যতীত মস্তকের শিরা বিদ্ধ করিবার প্রণালী এইরূপ।

পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে—যে পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে—সেই পা সমতল স্থানে স্থিরভাবে রাখিতে হইবে এবং অন্য পা খানি ঈষৎ সঙ্কুচিত ও উচ্চ করিয়া রাখিবে। অনন্তর বেধ্য পা খানির হাটুর নীচে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা পায়ের গুলফদেশ পীড়ন করিবে এবং বিদ্ধ করিবার স্থান হইতে চারি অঙ্গলি উপরে বস্ত্র বন্ধনাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া পদের শিরা বিদ্ধ করিবে। হস্তের উপরিভাগে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, চারি অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিবে এবং সুখকর ভাবে উপবেশন করাইয়া বিদ্ধ করিবার ন্যায় যন্ত্রিত অর্থাৎ বদ্ধ করিয়া হস্তের শিরা বিদ্ধ করিবে।

গৃধ্রসী (Sciatica) রোগে জানু সঙ্কুচিত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্রোণি (পাছা) পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠ দেশ উন্নত ও বিস্তৃত করিয়া এবং মস্তক নীচু করিয়া রাখিতে হয়। উদর ও বক্ষঃস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত এবং শরীর প্রসারিত রাখিতে হয়। পার্শ্বদেশের শিরা

বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হস্ত দ্বারা শরীর জড়াইয়া ধরিতে হয়। লিঙ্গের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে লিঙ্গ অবনত করিয়া রাখিতে হয়, জিহ্বার অধোভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া উপরের দন্তপাটিতে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। তালু এবং দন্তমূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মুখ খুব হাঁ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রোগ বিশেষে এবং স্থান বিশেষে যুক্তিপুর্ব্বক যাহাতে বেধ্য শিরা উন্নত হইয়া উঠে—এরূপ ভাবে অবস্থান করাইয়া বা যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

মাংসল স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে এক যব প্রমাণ শস্ত্র প্রবিষ্ট করাইবে। অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধযব প্রমাণ বা ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা এক ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। অস্থির উপর কুঠারিকা নামক শস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধ যব পরিমাণ বিদ্ধ করিতে হয়।

বর্ষাকালে মেঘ শূন্য দিবসে, গ্রীষ্মকালে শীতল সময়ে * এবং শীতকালে মধ্যাহ্নে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত।

সম্যক প্রকারে শস্ত্র প্রয়োগ করা হইলে রক্ত মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধারাকারে স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কুসুম ফুল পীড়ন করিলে প্রথমে যেমন পীতবর্ণ স্রাব হয় সেই রূপ শিরা বিদ্ধ করিলে প্রথমে দুষ্ট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছিত, ভীত, পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব হয় না। আবার রোগীকে যন্ত্রিত করিলেও যে সকল শিরা উন্নত হয় না, সেই সকল শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্ত স্রাব হয় না।

বহুদোষ বিশিষ্ট ক্ষীণ ব্যক্তির এবং মূর্চ্ছা পীড়িত অক্ষীণ ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে যদি রক্ত স্রাব না হয় এবং রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপরাহ্নে পর দিবসে বা তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার শিরা বিদ্ধ করা উচিত।

ক্ষীণ ব্যক্তির শরীর হইতে সমস্ত দূষিত রক্ত নির্গত করিবে না। কারণ অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ করাইলে বিপত্তি ঘটিতে পারে। অবশিষ্ট দোষ—দোষ নাশক ঔষধ দ্বারা প্রশমন করা উচিত। বলবান্, বহু দোষ যুক্ত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত (বালক বা বৃদ্ধ নহে) ব্যক্তির শরীর হইতে ১০৮ তোলা রক্তস্রাব করান যাইতে পারে।

পাদ-দাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, বিসর্প, বাতরক্ত, বাত-কণ্টক, বিচর্চ্চিকা ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্র মর্ম্মের (অঙ্গুষ্ঠ ও তৎপার্শ্বস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ মর্ম্মস্থলে) দুই অঙ্গুলি উপরে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্লীপদ রোগে ক্ষিপ্র মর্ম্মের চারি অঙ্গুলি উপরে বিদ্ধ উচিত। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গু রোগে—গুলফ দেশের চারি অঙ্গুলি উপরে জঙ্ঘা দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপচী রোগে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্মের (জঙ্ঘার মধ্যে পশ্চাৎ দিকে পায়ের গোড়ালি হইতে তের অঙ্গুলি উপরে ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম) দুই অঙ্গুলি নিম্নে শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। গৃধ্রসী রোগে জানু সন্ধির চারি আঙ্গুল উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিবে। গলগণ্ড রোগে উরু দেশের মূল ভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত এক সকথির (সমস্ত

* 'গ্রীষ্মকালেতু শীতলে" এই পাঠের ডল্লন টীকা 'তৃতীয় প্রহারানন্তরম্' এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তৃতীয় প্রহরের পর শীতল কাল নয়। বিশেষতঃ পুনরায় বিদ্ধ করিতে হইলে অপরাহ্নে বিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে প্রাতে বিদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

পায়ের) শিরা বিদ্ধ করিবার যেরূপ নিয়ম বলা হইল—অপর সকথির এবং বাহুর শিরাও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করিবে।

বিশেষতঃ প্লীহাবৃদ্ধি রোগে বাম বাহুর কূর্পর সন্ধির কনুয়ের অভ্যন্তরস্থ শিরা বা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে এবং যকৃৎবৃদ্ধি রোগে ও দক্ষিণ বাহুর ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কাস ও শ্বাস রোগেও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করা উচিত। বিশ্বচী রোগে গৃধ্রসীর ন্যায় অর্থাৎ কনুয়ের চারি অঙ্গুলি উপরে বা নিম্নে শিরা বিদ্ধ করিবে। শূলযুক্ত প্রবাহিকা রোগে কটীদেশের দুই অঙ্গুলির মধ্যস্থ স্থানের শিরা বিদ্ধ করা উচিত। পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) ও উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রজ রোগে লিঙ্গমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে কোষের পার্শ্বস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। জলোদরে নাভির অধোভাগে সেবনীর চারি অঙ্গুলি বামদিকে শিরা বিদ্ধ করিবে। অন্তর্ব্বিদ্রধি ও পার্শ্ব শূল রোগ বাম পার্শ্বে হইলে—বাম পার্শ্বের বগল ও স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, বাহু শোষ এবং অববাহুক রোগে স্কন্ধের মধ্যবিত্ত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তৃতীয়ক জ্বরে ত্রিক সন্ধির (গ্রীবা ও মধ্য শরীরের সন্ধি) অংশ নামক মর্ম্মদ্বয় বাদ দিয়া তৎসমীপবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করা উচিত। চাতুর্থক জ্বরে স্কন্ধসন্ধির অধোভাগে বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপস্মার রোগে হনু সন্ধির (চোয়ালের সন্ধি) মধ্য গত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ এবং অপস্মার রোগে বক্ষঃস্থল, ললাট এবং অপাঙ্গ দেশের সন্ধিস্থলে শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা রোগে ও দন্ত রোগে জিহ্বার অধোভাগস্থ এবং তালু রোগে তালুগত শিরা বিদ্ধ করা উচিত। কর্ণ-শূলে ও কর্ণ রোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে বিদ্ধ করা যাইতে পারে। নাসারোগে এবং ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইলে—নাসাগ্রে শিরা বিদ্ধ করা উচিত। তিমির নামক চক্ষুরোগে, চক্ষুর পাক শিরোরোগে, অধিমন্থ প্রভৃতি রোগে নাসিকার সমীপস্থ ললাট স্থিত এবং অপাঙ্গদেশে ভ্রূপুচ্ছ মধ্যবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিবার দোষ বিংশতি প্রকার, যথা—দুর্ব্বিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্চিত, কুট্টিত, অপ্রস্রুত, অত্যুদীর্ণ, অন্তে অভিহিত, পরিশুষ্ক, কুর্ণিত, ব্যাপিত, অনুত্থিত, বিদ্ধ, শস্ত্রহত, তির্য্যগবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অব্যাধ্য, বিদ্রুত, ধেণুকা, পুনপুনঃ বিদ্ধ এবং শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ। প্রত্যেকের লক্ষণ পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

সূক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদ্যপি রক্ত সম্যক প্রকারে স্রুত না হয় এবং বেদনা ও শোথ জন্মে তবে তাহাকে দুর্ব্বিদ্ধ বলা যায়। উপযুক্ত প্রমাণের অতিরিক্ত বিদ্ধ করিলে যদি শোণিত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অথবা অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হয়, তবে তাহাকে অতিবিদ্ধ বলে। কুঞ্চিত অর্থাৎ বিদ্ধ স্থান কুটিলীভূত হইলেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধারহীন (ভোঁতা) অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদি বিদ্ধস্থান মথিত হইয়া ফুলিয়া উঠে তবে তাহাকে পিচ্চিত বলা যায়। শস্ত্র যদি সম্যক্ প্রমাণ অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে কুট্টিত বলা যায়। শীত, ভয় এবং মূর্চ্ছার জন্য যদি রক্তস্রাব না

হয়, তবে অপ্রকৃত বলা যায়। তীক্ষ্ণ ও বৃহৎ মুখ বিশিষ্ট শস্ত্র দ্বারা অধিক পরিমাণে বিদ্ধ করিলে তাহাকে অত্যুদীর্ণ বলে। অল্প রক্তস্রাব হইলে অন্তে অভিহত বলা যায়। অল্প রক্ত বিশিষ্ট শক্তির বিদ্ধ স্থান বায়ু পূর্ণ হইলে তাহাকে পরিশুষ্ক বলে। উপযুক্ত প্রমাণের চতুর্থাংশ মাত্র বিদ্ধ হইয়া অল্প রক্তস্রাব হইলে তাহাকে কুণিত বলে। কম্প-বান ব্যক্তির অনুপযুক্ত স্থানে বন্ধন হেতু শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে ব্যাপিত বলে। বেধ্য শিরা উত্থিত হইলে যদি বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে রক্তস্রাব হয় না। ইহাকে অনুষ্ঠিত বলে। শিরা ছিন্ন হইয়া যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় এবং গমন ও গ্রহণাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, তবে তাহাকে শস্ত্রহত বলে। তির্য্যকভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করায় যদি সম্যকরূপ বিদ্ধ না হয় তবে তাহাকে তির্য্যক্‌বিদ্ধা বলে। হীন শাস্ত্র প্রয়োগ হেতু অধিক ক্ষত হইলে অপবিদ্ধ বলা যায়। শস্ত্র প্রয়োগের অযোগ্য স্থানে বা অযোগ্য ব্যক্তিকে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহাকে অব্যাধ্যা বলে। অব্যবস্থিত (তাড়া-তাড়ি বা কম্পিত হস্তে) ভাবে বিদ্ধ করিলে তাহাকে বিদ্রুত বলে। উপর্য্যুপরি শস্ত্র প্রয়োগ করিলে মুহুর্মুহু শোণিত স্রাব হইতে থাকে, ইহাকে ধেনুকা বলা যায়। সূক্ষ্ম শস্ত্র দ্বারা এক স্থানে বহুবার বিদ্ধ করা হইলে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইলে অত্যন্ত বেদনা, শোষ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এইজন্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। কেননা অজ্ঞানতা বশতঃ শিরা বেধের দোষ ঘটিলে নানাপ্রকার বিপত্তি ঘটিতে পারে।

শিরা বিদ্ধ করিলে যত শীঘ্র ব্যাধি প্রশমিত হয়, স্নেহ প্রয়োগাদি এবং লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা তত শীঘ্র প্রশমিত হয় না। কায় চিকিৎসা মধ্যে যে বস্তি ক্রিয়াকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে, শল্য তন্ত্রে সেইরূপ শিরাবেধকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে।

স্নিগ্ধ, স্বিন্ন, বান্ত, বিরিক্ত, আচ্ছাপিত, অনুবাসিত ও শিরা বিদ্ধ ব্যক্তিগণ শরীর সবল না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোধ, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত কথা বলা, ব্যায়াম, যানে ভ্রমণ, অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকা, ভ্রমণ, শীত,বায়ু ও রৌদ্র সেবন, বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ কেহ বলেন। এক মাস কাল এই-রূপ নিয়ম পালন করা উচিত।

—·—

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রাতরুত্থান।

—:০:—

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার এইচ এল, এস, এস)।

স্বাস্থ্য কামী ব্যক্তি অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই গাত্রোত্থানের উপযুক্ত কাল। সূর্য্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা বা অর্দ্ধ প্রহর কালের মধ্যে দুইটি মুহূর্ত্ত আছে, তাহার প্রথম মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভোর ৪ ঘটীকায়, বর্ষাকালে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ৪ ঘটীকা ৪৫ মিনিটে বা ৪। সোয়া চারিটায়, ভাদ্র আশ্বিন মাসে ৪॥ টায়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষে পাঁচটায়, পৌষ মাঘ মাসে ৫ ঘটিকায় এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ৫। সোয়া পাঁচ ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করা সকল সুস্থ ব্যক্তিরই নিতান্ত প্রয়োজন। তবে অসুস্থ ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের এই সুন্দর সময় শাস্ত্রে "মধুময় সময়" বলে। এ সময় মধুর বায়ু প্রবাহিত হয়, সাগর ও নদীগণ মধু ক্ষরণ করে, বৃক্ষলতাগণ মধুর ভাব ধারণ করে, এমন কি পার্থিব ধূলিকণা পর্য্যন্ত মধুবৎ হইয়া থাকে। এ স্থলে মধু শব্দের অর্থ কল্যাণকর বা স্বাস্থ্যপ্রদ। ফলতঃ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে বহু উপদেশ উক্ত আছে। শাস্ত্রকারগণ সে কালের বর্ণন অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন।—

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রাতরুত্থানের উপকারিতা বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াই প্রাতঃকালীন ভ্রমণ বা (morning walk) ব্যবস্থা করেন। এসম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ একটি পদ্য ও ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন যে,—

"The early bed and early rise
Makes the man healthy wealthy
and wise."

অর্থাৎ

সকালে শয়ন আর প্রত্যুষে উত্থান—
বৃদ্ধি করে মানবের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান।

কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র প্রাতঃকালীন ভ্রমণের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রত হইবামাত্রেই সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এবং দেবতা ও সাধুগণের নাম স্মরণ এবং শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গত রাত্রের কৃতাপরাধ সমূহের মার্জ্জনা এবং অদ্যকার শুভদিন প্রার্থনা করিয়া লইয়া শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেরূপ আচরণ করিলে মঙ্গলময় পরম পিতার করুণায় সমস্ত দিন মঙ্গল ভাবে নিরাপদে কাটিয়া যায়। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তি উপেক্ষা করা উচিত নহে। হিন্দুর যাবতীয় কার্য্যেই ভগবানের নাম স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর শয্যাত্যাগকালে "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি,জানাম্য ধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥" গীতোক্ত এই সার শ্লোকটি পাঠ করতং "প্রিয় দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া

প্রথমতঃ দক্ষিণপদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে।

বিষ্ঠামূত্রোৎসর্গ।

উত্থিত হইয়া চক্ষু ও মুখে জল দিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন পূর্ব্বক মল মূত্র বিহীন শুচি স্থানে অবস্থিতির স্থান হইতে নৈঋত কোনে বান বিক্ষেপ যোগ্য স্থানের বাহিরে অর্থাৎ সার্দ্ধ শত হস্তের বাহ্য-দেশে যত্নে ষ্ঠীবন ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জিত মৌনী এবং সমাহিত চিত্তে উভয় পাটির দন্তে দন্তে দৃঢ় লগ্নভাবে আবদ্ধ করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করিবে। সেস্থানে অধিককাল অবস্থান করিবে না এবং বাক্যোচ্চারণ করিবে না। দিবাভাগে উত্তর মুখও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। রুগ্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই সন্ধ্যাকালে মলাদি ত্যাগ করিবে না।

উক্তরূপ ব্যবস্থায় আধুনিক পায়খানায় মল মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাহাতে উক্ত কোন নিয়মই স্থির রাখিবার উপায় নাই। প্রাতঃকালে পুষ্পাদির মনোরম সুগন্ধের পরিবর্ত্তে পায়খানার দুর্গন্ধ গ্রহণ যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনি কালমাহাত্ম্য যে, আজ কাল বিশেষতঃ সহরবাসিগণের পক্ষে সেই বিষময় অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ প্রত্যহ—এমনকি দৈনিক দুই তিন বারও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কিরূপে, এই নিমিত্তই সহরাপেক্ষা পল্লীবাসী এ পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

বিষ্ঠামূত্র ত্যাগকালে দ্বিজাতি গৃহী যজ্ঞো-পবীতকে পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হারবৎ কণ্ঠ লম্বিত, অথবা মস্তক অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিবেন। তবে যদি প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা থাকে কিম্বা কোন কারণে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে দ্বিজ সকল ছায়াতে কি অন্ধকারে দিবাতে কি রাত্রিতে নিজের সুবিধামত যে কোন মুখে উপবিষ্ট হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। সূর্য্য, জল, গো ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া এবং পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, হালকর্ষিত ভূমিতে, জলে, শ্মশানে, ইষ্টকস্তূপে, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবায়তনে বল্মীক প্রাণী বিশিষ্ট গর্ত্তে, গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মানাবস্থায়, নদীতীরে, পর্ব্বত মস্তকে এবং বায়ু অগ্নি ও ব্রাহ্মণ এবং জল, সূর্য্য ইহা দিগকে দর্শন করিতে করিতে কদাচ বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। এতাদৃশ অহি-তাচার করিলে সে ব্যক্তি চির রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আহার বিহার এবং মূত্র পুরীষোৎসর্গ সর্ব্বদা অতি গোপনীয় স্থানে করিতে হইবে। এরূপ সদাচরণ করিলে মানব শ্রীযুক্ত হয় নচেৎ শ্রীহীনতা অবশ্যম্ভাবী। পাদুকা পায়ে দিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। (এখন অনেকেই এরূপ করেন) জলপাত্র হস্তে করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলে পাত্রস্থিত জল মূত্র তুল্য হয়। অতএব উহা দূরে নিক্ষেপ করিবে।

শৌচ।

স্বাস্থ্যকামী ও ধর্ম্মবিদ ব্যক্তি অধঃ শৌচে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিবে না। পক্ষান্তরে বাম হস্ত দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধ স্থান শোধন করিবে না। সুস্থাবস্থায় উক্তরূপ আচরণ এবং প্রত্যেকবার মল বা মূত্র ত্যাগান্তে পদ ধৌত করিবে। পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি ইহার ব্যতি ক্রম করিতে পারিবেন।

মল ত্যাগান্তে সুন্দর পবিত্র স্থানে বাগ্‌যত হইয়া উদ্ধৃত জল এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রথমে মৃত্তিকা বাম হস্তে লেপন করতঃ মর্দ্দন করিবে, পরে যাবৎ মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ধৌত না হয়—সে পর্য্যন্ত বারম্বার জল প্রয়োগ করিবে। এইরূপে হস্ত হইতে মলগন্ধ বিদূরিত হইলেই শৌচ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বল্মীক, মূষিকোৎখাত, জলমধ্যস্থিত শৌচাবশিষ্ট, গৃহ হইতে, লেপ সম্ভব, সকর্দ্দম এই সকল মৃত্তিকা শৌচ কার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না।

বিষ্ণু পুরাণ, দক্ষ সংহিতা ও যম সংহিতা প্রভৃতিতে মৃত্তিকা প্রদানের নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত অঙ্গ সকল মল-গন্ধ-শূন্য না হয় সে পর্য্যন্ত বারম্বার মৃত্তিকা সংযোগ এবং জলদ্বারা ধৌত করিবে। বর্ত্তমানকালে এপ্রকার শৌচাচার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এ কার্য্য কিছুমাত্র কঠিন নহে, কিন্তু বহুকালের অভ্যাস বশতঃ প্রথমাভ্যাসে দিনকতক আলস্য আসিতে পারে। কিন্তু তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আলস্য বা উদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত রূপ অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্য সুখ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মূত্র শৌচ।

এ কার্য্যটি আধুনিক সভ্যতায় এক কালেই বিলুপ্ত হইয়াছে। একালের শিক্ষিত সম্প্রদায় এসকল উপদেশের বিন্দুমাত্রও প্রাপ্ত হন না বা আদর্শ কোন শুচি ব্যক্তিকেও দেখিতে পান না। সুতরাং এ বিষয়ের প্রচলন আর লক্ষিত হয় না। ফলে মূত্র ত্যাগের পর জল না লওয়ায় একালে নানাপ্রকার মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় আধিক্য ঘটিয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতির পরিচ্ছদানুরোধে দণ্ডায়মানাবস্থায় যথায় তথায় মূত্র ত্যাগের আদর্শে কতিপয় হিন্দু সন্তানকেও উক্ত অনাচার অনুকরণে বাধ্য করিয়াছে। বহুদিন এতাদৃশ কদাচার করিবার পর যখন পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে অধিক লোকের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা উক্ত প্রকারে মূত্র ত্যাগকেই তাহার কারণ মনে করিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনুকরণ প্রিয় হিন্দুসন্তান মধ্যে অদ্যাপি অসদাচরণ পরিত্যক্ত হয় নাই। ফলতঃ উক্তপ্রকারে মল ত্যাগ কেবল মূত্রকৃচ্ছ্র কেন, বহু কঠিন রোগেরও কারণ হইতে পারে। সকল প্রকার শৌচাচার অতি যত্নের সহিত অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, যাহারা শৌচাচারে উদাসীন তাহাদের শরীর চিররুগ্ন হইয়া যাবতীয় সদনুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়া থাকে। সদাচার পালনের ফলেই হিন্দু জাতি যে একদিন অতুল স্বাস্থ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল ইহা অবিসংবাদিত।

শিশু-পালন।

—:*:—

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।)

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে আমরা যতবার খাদ্য গ্রহণ করি, ততবারই রক্ত পরিপুষ্ট হয়। আমরা যদি পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের রক্তও বিশুদ্ধ ও পুষ্ট হয় এবং দেহও বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে।

রক্ত কি? রক্ত একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহাতে অসংখ্য অনু-কোষ (corpuscles) ভাসিয়া বেড়ায়। অনু-কোষ দুই প্রকারের—এক রকম লাল, এক রকম সাদা। রক্ত সাধারণতঃ দেখিতে লাল বর্ণের। রক্তে যে লাল অনু-কোষ ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারই জন্য রক্তের রঙ লাল। এই অনু-কোষ হইতে পৃথক করিলে রক্ত দেখিতে ঠিক ডিমের সাদা তরলাংশের ন্যায় দেখায়। রক্তে লাল অনুকোষের সংখ্যাই অধিক, সাদা অনু-কোষ তদপেক্ষা অনেক কম আছে। রক্তের এই অনুকোষগুলি শুধু চক্ষে দেখা যায় না। আমরা তাই শুধু লাল বর্ণের একটি তরল পদার্থ দেখি। এক ফোঁটা রক্ত যদি অনুবীক্ষণের নীচে রাখা যায়, তাহা হইলে রক্তের এই লাল ও সাদা অনুকোষগুলি দেখা যায়। লাল অনুকোষগুলি এত ছোট যে, ৩৫০০ লাল অনুকোষ যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমি আবৃত করে, আর যদি ১০ হাজার অনুকোষ উপরি উপরি করিয়া থাক্ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উচ্চতায় এক ইঞ্চি হইবে। সাদা অনুকোষগুলি ইহার অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের আকার মটরের ন্যায় এবং অন্য অসমান আকারেরও আছে।

রক্তের এই তিনটি অংশের কার্য্য এই :—

(১) ডিমের ন্যায় তরলাংশ দেহের কোষ-গুলির পুষ্টিসাধন করে এবং খাদ্যের জীর্ণ করা শর্করা ও মেদময় অংশ মস্তিকে ও মাংস-পেশীতে বহন করিয়া লইয়া যায়।

(২) লাল অনুকোষগুলি ফুস্‌ফুস হইতে বিশুদ্ধ বাতাস লইয়া Tissueতে এবং Tissue হইতে দূষিত বাতাস ফুসফুসে লইয়া যায়। ইহারা বাতাস বহনের কার্য্য করে।

(৩) সাদা অনুকোষগুলি সমস্ত আঘাত জুড়িয়া দেয়। যত ঘা—কাটা ঘা, ভগ্ন হাড় এই সাদা অনুকোষই জুড়িয়া দেয়। ইহারা রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

আমাদের দেহে অসংখ্য রক্তবহা নালী আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালীর মধ্যে একটি প্রধান নালী আছে। এই নালীটি হৃৎপিণ্ডের বামদিকে অবস্থিত করিতেছে। ইহা হইতেই সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ রক্ত-

বহা নালী বাহির হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালী দিয়াই আমাদের দেহের রক্ত চলাচল করিতেছে। এই নালীগুলির গাত্র এত পাত্‌লা যে, আমাদের মস্তিষ্ক মাংসপেশী ও গ্রন্থি glands গুলির মধ্য দিয়া রক্ত চলিবার কালে তাহারা রক্ত হইতে তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য টানিয়া লয়। রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়া রক্ত নিয়তই চলিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও থামে না। হৃৎপিণ্ডই রক্তকে রক্তবহা নালী দিয়া ক্রমাগত চালিত করিতেছে। প্রত্যেক স্পন্দনে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবহা নালী দিয়া কিছুদূরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড ৬০।৭০ বার স্পন্দিত হয় বলিয়া রক্তের প্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে।

রক্ত একটি গোলাকার আবর্ত্তের ন্যায় আমাদের দেহে অনবরত ঘুরিতেছে। হৃৎপিণ্ড একটি নালী দ্বারা রক্তকে বাহির করিয়া দেয় এবং অন্য একটি নালী দ্বারা রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আগমন করে। এইরূপে রক্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আমাদের দেহের সমুদয় অংশে পুষ্টিকর খাদ্য এবং বাতাস যোগাইবার জন্যই রক্ত এইরূপ গোলাকার ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিশুদ্ধ বাতাসে পূর্ণ হইয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমগ্র দেহের প্রত্যেক অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবিশুদ্ধ অবস্থায় পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। আসিবার পথে খাদ্যের সারাংশ বহন করিয়া আনে। এই অবিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় সমগ্র দেহে চালিত হইবার পূর্ব্বে ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ বাতাস এবং পরিপাক যন্ত্র হইতে পুষ্টিকর খাদ্যে পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিরূপে এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য চিত্র দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের পরিচালকবর্গের অসুবিধার জন্য উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিলনা, ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তাহা প্রদর্শিত হইবে।

হৃৎপিণ্ড ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের চারিটি ঘর আছে। উপরে দুইটি এবং নীচে দুইটি। উপরে বামদিকে একটি ইহাকে বাম auricle এবং নীচে বাম দিকে একটি ইহাকে বাম Ventricle বলে এবং উপরে ডানদিকে একটি ইহাকে right auricle এবং তাহারি নীচে ডান দিকে একটি ইহাকে right ventricle বলে। উপরে বামদিগের ঘর হইতে উপরের ডানদিকে ঘরে যাইবার দ্বার নাই, কিন্তু উপরের বামদিকের ঘর হইতে নীচের বামদিগের ঘরে যাইবার একটি দ্বার আছে। তেমনি উপরের ডানদিকের ঘর হইতে নীচের ডানদিকের ঘরে যাইবার একটি দ্বার আছে। ডানদিকের দুইটি ঘরে অবিশুদ্ধ রক্ত এবং বামদিকের ঘর দুইটিতে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামদিক, বিশুদ্ধ রক্ত দেহের প্রধান রক্তবহা নালীতে চালিত করিয়া দেয়, এই নালী দেহের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রক্ত লইয়া যায়। দেখ। এই নালী দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালী দিয়া চালিত হইয়া দেহের প্রত্যেক tissueতে রক্ত যোগান দেয়। তা'রপর পুনরায়

প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া চলিয়া আসিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণে প্রবেশ করে। আসিবার কালে পথে ইহা একটি শিরার সহিত মিলিত হয়। এই শিরা পরিপাক ক্রিয়া শেষ হইবার পর খাদ্যের সারাংশ লিভারের মধ্যে দিয়া বহন করিয়া আনিয়া এই প্রধান রক্তবহা নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিক হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। তথায় বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুস হইতে হৃৎপিণ্ডের বামদিকে প্রবেশ করে। এইরূপে ফুসফুস এবং সমগ্র দেহে রক্ত নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে। আমাদের দেহের রক্ত এইরূপে প্রতি মিনিটে দুইবার করিয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিতেছে।

ধমনী (arteries)।—হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসে এবং দেহের সর্ব্বত্র রক্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়াই ধমনীর কার্য্য। আমাদের দেহের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ধমনী ছাইয়া রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে ধমনী সকলও কম্পিত হয়। আমাদের হাতের কব্জিতে যাহাকে নাড়ী বলি, তাহাও একটি ছোট ধমনী। ইহা আমাদের হাতে রক্ত যোগাইতেছে।

বিশুদ্ধ লাল রক্ত—ধমনী দিয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে যে ধমনী ফুসফুসে গিয়াছে—তাহা অপরিষ্কৃত কাল্‌চে রঙের রক্ত ফুসফুসে পরিষ্কৃত হইবার জন্য লইয়া যায়।

শিরা (veins)। ধমনীর পাশাপাশি শিরাগুলি রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাহির হইয়া সমগ্র দেহে কার্য্য করিতে দেহের ময়লার সহিত যুক্ত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। শিরাগুলি এই অপরিষ্কৃত রক্ত বহন করিয়া হৃৎপিণ্ডে লইয়া আসে। হৃৎপিণ্ড হইতে এই অপরিষ্কৃত রক্ত একটি ধমনী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ধমনীর নাম Pulmonary artery। সেখানে শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা এই দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হইয়া আর একটি শিরা দিয়া বাম দিগের হৃৎপিণ্ডে যায় এবং সেখান হইতে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় যে বায়ু নাক দিয়া টানিয়া লই, তাহাতে যে অম্লজান বাষ্প (oxygen) থাকে তাহাই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দূষিত ও অবিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে Pulmonary artery দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহাকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। এই জন্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের খাদ্য রক্তে পরিণত হইয়া দেহের সর্ব্বাঙ্গে নিরন্তর পরিচালিত হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। শিশুর দেহও এইরূপে পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া।

আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য চারিটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। (১) নাক, (২) শ্বাস-নালী, (৩) ফুসফুস, (৪) বক্ষ।

শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য নাকই আমাদের প্রধান, স্বাভাবিক উপায়। আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ফেলা অস্বাভাবিক। নিশ্বাস নাক দিয়া যাইতে যাইতে গরম হইয়া উঠে এবং এই গরম অবস্থাতেই ফুসফুসে প্রবেশ করে। সুতরাং বাহিরের বায়ুর শৈত্য ফুস

ফুসে লাগিতে পারে না। আমাদের নাকের ভিতরে লোম আছে। বাহিরের বায়ুতে যে ধূলা এবং ময়লা থাকে, তাহা এই লোমে আটকাইয়া যায়, সুতরাং নিশ্বাস দ্বারা ফুস-ফুসের মধ্যে যে বায়ু যায়—তাহা ধূলিশূন্য নির্ম্মল করিবার ব্যবস্থা ভগবান করিয়া রাখিয়াছেন। নাক দিয়া যে বায়ু আমরা টানিয়া লই—তাহা গরম এবং নির্ম্মল হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে ঠাণ্ডা, ধূলিপূর্ণ বায়ু আমাদের ফুস ফুসে প্রবেশ করে এবং নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়।

নিশ্বাস দ্বারা আমরা যে বায়ু টানিয়া লই. তাহাতে যে অম্লজান বাষ্প থাকে তাহাই হৃৎপিণ্ড হইতে যে দূষিত রক্ত ফুস ফুসে প্রবেশ করে তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। বিশুদ্ধ বায়ুতে শতকরা ২১ ভাগ অম্লজান এবং ৭৯ যবক্ষরজান আছে। এতদ্ব্যতীত কিছু অঙ্গার দ্রাবক (carbonic acid) জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য পদার্থ বায়ুতে বিদ্যমান আছে। এইরূপে অম্লজান নিশ্বাসের সহিত ফুস ফুসে প্রবেশ করিয়া দূষিত রক্ত নির্ম্মল করে। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাস দ্বারা ফেলিয়া দিই,তাহাতে ৪ কি ৫ ভাগ অম্লজান কম থাকে এবং অঙ্গার দ্রাবকের ভাগ বাড়ে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে বায়ু আমরা শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে টানিয়া লই, তাহা প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ফেলিয়া দিই তাহার অপেক্ষা বিশুদ্ধ। কারণ এই প্রশ্বাসের বায়ুতে অম্লজানের ভাগ কম থাকে। শ্বাস নলী। ফুস ফুসে বায়ু যাইবার প্রধান পথই শ্বাস নলী। ইহা গলনালীর সম্মুখ ভাগে প্রায় ইহার পাশা পাশি হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। শ্বাস নলীর ভিতরেও এক রকম শুঁয়া আছে, তাহা বায়ুর ময়লা ধরিয়া শ্লেষ্মার সহিত মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ফুস ফুস।—হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে দুইটি ফুস ফুস অবস্থিতি থাকিয়া বক্ষোগহ্বর জুড়িয়া আছে। হৃৎপিণ্ডের ডানদিকে একটি এবং বামদিকে একটি ফুসফুস রহিয়াছে। বাতাস শ্বাসনলী এবং বায়ু নলী (bronchial tubes) দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুস ফুসের মধ্যেই বায়ু—রক্তের সম্পর্কে আসে। শ্বাসনলী বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি ডান ফুসফুসে এবং অপরটী বাম ফুসফুসে গিয়াছে। এই দুইটি শাখার নাম বায়ু নলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউব। প্রত্যেক বায়ুনলী ফুসফুসের ভিতর গিয়া অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আবার বায়ু নলী গুলি ফুসফুস কোষে (lung sac) গিয়া ঠেকিয়াছে। ফুসফুস কোষে অসংখ্য বায়ুকোষ (air-cells) আছে। এক একটি ফুস ফুস কোষে প্রায় ১৭০০ বায়ুকোষ আছে। বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবেই ব্রঙ্কাইটিস অসুখ হয়। এই পীড়া খুব বেশী হয় এবং ইহাতে মৃত্যুর সংখ্যাও অধিক হয়।

আমাদের নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করিলেই সেখানে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

(১) বাতাসের অম্লজান বাষ্প (oxygen) রক্তের মধ্যে যায়।

(২) অঙ্গারাম্লজান বাষ্প (অবিশুদ্ধ বাষ্প) উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়।

সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের সহিত বিশুদ্ধ অম্ল-

জান বাষ্প রক্তের মধ্যে যায় এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে অবিশুদ্ধ বাষ্প, উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের দেহের রক্ত নিরন্তর বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। এই ক্রিয়ার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু সম্ভাবনা।

বক্ষ।—বক্ষ একটি বায়ু চলাচল শূন্য বাক্স বিশেষ। ইহার আকার একটি কোণের ন্যায়। ইহার দুই পার্শ্বে পাঁজরার হাড় অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহার উপরে চামড়া ও মাংসপেশী সমূহ আছে। বক্ষের নিম্নদেশে বক্ষ এবং পেটের মধ্যস্থলে একটি চওড়া মাংসপেশী আছে, তাহাকে মিড্রিফ* বলে। বক্ষোগহ্বরে ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড পূর্ণ করিয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

যকৃতের যৎকিঞ্চিৎ।

—:০:—

("হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত)

কত লোকই যে যকৃতের নানারকম রোগে ভুগিয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। নর দেহের যকৃৎ নামে এই যে একটি প্রধান গ্রন্থি-সমষ্টি, ইহার কল-কব্জা এত সহজে কেন বিকল হইয়া বিগড়াইয়া যায়? লিভার বা যকৃতের কর্ত্তব্য কার্য্য কি, আগে যদি আমরা সেটা জানিতে পারি, তাহা হইলেই এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া অনেকটা সহজ হইবে।

যকৃতের প্রধান কার্য্য হইতেছে, দেহের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে যে সকল অনিষ্টকর উপাদান বর্ত্তমান থাকে, যকৃৎ সেগুলিকে রক্তের সহিত মিশিতে বা ভিতরে যাইতে দেয় না।

আমরা যাহা-কিছু আহার বা পান করি, পাকস্থলী ও হজম-নলীর ভিতরে গিয়া আগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর সেই জীর্ণাবশিষ্ট খাবারের শাঁসগুলি লিভারকে পার হইয়া, ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করে। যকৃৎ কিন্তু সেই প্রবেশ-পথের মুখে চালাক দরোয়ানের মত বসিয়া, কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে। শিষ্টদের পথ ছাড়িয়া দিয়া, সে তখন দুষ্ট উপাদানগুলিকে দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু যকৃৎ যখন খারাপ হইয়া যায়, তখন কি হয় বলুন দেখি? তখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট, ইষ্টকর এবং বিষাক্ত সকল রকমেরই খাদ্য-পানীয় ঘুমন্ত বা আধ-ঘুমন্ত যকৃৎ-দ্বারবানকে এড়াইয়া, দেহের মধ্যে ডাকাতের মত প্রবেশ করে এবং রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়। মানুষের দেহঘরে তখন যে-কোন ভয়ানক ব্যাপার ঘটিতে পারে।

উপরের কথাগুলি পড়িয়া আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, লিভারের প্রধান কর্ত্তব্য হই-

---

* মিড্রিফ দ্বারা আমরা প্রধানতঃ শ্বাস গ্রহণ করি।—লেখিকা।

তেছে, ভুক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলিকে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া দেহ ও রক্তের মধ্যে যাইতে দেওয়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাদ্যগুলি দেহের ভিতরে গিয়া, এক জটিল রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের মুখে পড়িয়া, পুরাতন রক্তের অভাব মোচন করে এবং নূতন রক্তের যোগান দেয়। এই যে রক্ত,—ইহারই অন্য নাম, মানুষের জীবনী শক্তি। কেননা, ইহার অভাবে আমরা কেহই বাঁচিতে পারি না।

কাল যে মাংস ছাগলের দেহে ছিল, আজ সেই মাংসই যকৃতের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, মানুষের দেহে মিশিয়া মানুষেরই দেহের নিজস্ব পদার্থে পরিণত হইল!

কিন্তু লিভার যখন পরীক্ষা করে না, তখন কোন-কিছুই নর-দেহের উপকারী উপাদানে পরিণত হইতে পারে না। পরন্তু, সেক্ষেত্রে মানুষের জীবন একান্ত ভারবহ হইয়া ওঠে। দেহের সমস্ত যন্ত্র তখন খাপছাড়া হইয়া পড়ে এবং যত-কিছু অসার পদার্থ ভিতরে ঢুকিয়া শরীর ও মনকে বিষ জর্জ্জর করিয়া তোলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিত্তরসের কথা ধরা যায়। এই পিত্তরস যখন সোজা উদরগর্ভে গিয়া পড়ে, তখন তাহার সাহায্যে শরীর যথেষ্ট উপকৃত হয়। কিন্তু যকৃত যখন অকেজো, তথাকথিত পিত্তরস তখন বিপথগামী হইয়া পাকাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে থেকে তাহা আবার—খুব সম্ভব—উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। ফলে বিষের তেজে আপনার ভয়ানক মাথা ধরিবে, মন হ্যাতাইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, মুখের আস্বাদ তিক্ত হইয়া উঠিবে, ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যাইবে, জিভের উপরে একটা প্রলেপ পড়িবে এবং হয় কোষ্ঠবদ্ধ, নয় উদরাময় হইবে।

অতঃপর যকৃৎ অকেজো হইয়া পড়িবার কারণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ, যকৃৎকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করা। পেটে ঠাসিয়া মাংস বা মদ খাওয়ার অভ্যাস করিলে বা বেশী মিষ্ট ও মশলাদার দুষ্পাচ্য খাদ্য নিয়মিত রূপে ভক্ষণ করিলে, যকৃৎ অত্যধিক পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

লিভার খারাপ হইবার দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। আপনি যত বেশী পেট ভরিয়া খাইবেন, তত কম নড়া চড়া করিতে পারিবেন। আবার, কেহ কেহ যেমন পেটুক হইয়া সে অভ্যাস আর ছাড়িতে পারে না, তেমনি অনেকে আবার এমন বিষম আলস্যে অভ্যস্ত হয় যে, দেহকে ক্রমেই তাহারা একটা অসার জড়পদার্থে পরিণত করিয়া ফেলে।

সাদাসিধে, সুস্বাদু ও পোষ্টাই জিনিষ খাইবেন,—কিন্তু পেট ঠাসিয়া নয়। প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিত ভোজনের পর, মাঝে মাঝে যখন তখন টুকিটাকি খাবার খাওয়ার বদ অভ্যাস ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে আর যকৃৎ খারাপ হইবার ভয় থাকিবে না।

উপরন্তু, প্রত্যহ অন্ততঃ পনেরো মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা (যাঁহার যতক্ষণ সহ্য হয়) কাল পর্য্যন্ত নিয়মিত ব্যায়াম করিবেন। প্রাত্যহিক প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে আমরা যদি ব্যায়ামকেও ধরিয়া লই, তাহা হইলে শুধু যকৃতের পীড়া কেন, অধিকাংশ দুর্ব্বলতা এবং অসুস্থতাই মানব সমাজ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। জীবন্মৃত ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পৃথিবীর কোন আনন্দই সম্ভোগ করা যায় না। এই আনন্দের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে ক্ষতি কি?

সুস্থদেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কিনা?

বিবিধ মাদক দ্রব্য জগতের শৈশবকাল হইতে সমাজে প্রচলিত আছে। বন্য বর্ব্বর জাতি হইতে সুসভ্য উন্নতজাতি পর্য্যন্ত মাদক দ্রব্যের প্রভাব হইতে কেহই অব্যাহতি পায় নাই। ধনীর টেবিলে মাদক দ্রব্য "শাম্‌পেন" "হুইস্কি" রূপে এবং বন্য দরিদ্রের কুটীরে মৃৎপাত্রে "হাঁড়িয়া" "মহুয়া"রূপে বিরাজিত। মাদক দ্রব্য ধনীর গৃহে বহুমূল্য সিগারেট সিগার বা অম্বুরি তামাকরূপে, কৃষকের কুটীরে গুড়ুকরূপে, সহিস, কোচমান ও দরিদ্র ভদ্র লোকের মুখে সস্তার সিগারেট বা বিড়ি রূপে এবং মুটে কুলি ও দরোয়ানদিগের মুখে 'শুথা' বা 'খইনি' রূপে বিরাজিত! মাদক দ্রব্য দরিদ্রের অন্তঃপুরে গুল বা তামাক পোড়া রূপে এবং আঢ্য ব্যক্তির অন্তঃপুরে মৃগনাভি সুগন্ধি জর্দ্দা রূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গুড়ুক-বিড়িও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আবার অনেক সভ্য মহিলার বিম্বাধর-চুম্বনের সুখ সিগারেটের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে কিনা জানি না! মাদক দ্রব্য কি মোহিনী শক্তি বলে সভ্য অসভ্য, ধনবান, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভোগী, ত্যাগী, নর, নারী, সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সকলেই যে ইহার প্রভাবে মুগ্ধ ইহা নিশ্চিত। আমাদের দেশের ত্যাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু নস্য প্রয়োগে নাসা-রন্ধ্রের তৃপ্তি সাধন করিতে পশ্চাদপদ নহেন। স্যর ওয়ালটার রালের সঙ্গীগণ আমেরিকা বাসী অসভ্য জাতিদিগকে ধূমপান করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহারা দানবের ন্যায় মুখ দিয়া ধুম বাহির করে। কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে সেই দানবোচিত কার্য্যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই ব্যাপৃত হইয়াছে!

যে কারণেই মাদক দ্রব্যের এইরূপ বহুল প্রচলন হউক, শরীরের সহিত উহার একটা সম্বন্ধ আছে। দ্রব্য মাত্রেই ত্রিবিধ কারণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম রোগশান্তির জন্য, দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এবং তৃতীয় সুস্থব্যক্তির শরীর রক্ষার জন্য। রোগ শান্তির জন্য বিবিধ মাদকদ্রব্য প্রয়োগের সার্থকতা দেখা যায়। সুস্থ শরীরে শরীর রক্ষার জন্য মাদক দ্রব্য উপযোগী কি না, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে এবং এই প্রসঙ্গেই মাদক দ্রব্য পরমায়ু বৃদ্ধি করে কি না —তাহা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে।

মাদক দ্রব্য নানা প্রকার, যথা মদ্য, অহিফেন, গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এবং তামাক। আমরা প্রথমতঃ মদ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

মদ্য।

মদ্য ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। কেবল মনুষ্য সমাজে নহে, দেব সমাজেও মদ্যের আদর যথেষ্ট—ইহার পরিচয় গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় এমন কি, সময়ে সময়ে

মদ্যের অংশ লইয়া বিষম বিবাদ বিসংবাদ ঘটিত এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। চ্যবন ঋষি রাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের জন্য সোম রস গ্রহণ করিতে উদ্যত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল। এই যে মনুষ্য এবং দেবতার (হস্তী প্রভৃতি পশুরও বটে) আদরের ধন মদ্য—ইহা কি সুস্থ শরীরে সেবন করা হিতকর না আবশ্যক? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্র কি বলেন তাহা দেখা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে ভারতে মদ্যের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে মদ্যপান অত্যন্ত দূষনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যকে অদেয়, অপেয় এবং অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রে মদ্যের প্রতি এই যে বিদ্বেষ, ইহা শরীরের হিতাহিতত্ব বিচার করিয়া নহে। মদ্য অল্প মাত্রায় পান করিলে আরও অধিক পান করিতে ইচ্ছা হয়, মদ্যপায়ী দ্বারা বিবিধ পাপকার্য্য সংঘটিত হয়, মদ্য পানের ফলে পরিবারবর্গের এবং সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐরূপ নিষেধ করা হইয়াছে। মদ্যপায়ীবহুল পাশ্চাত্য দেশেও মদ্য পান দ্বারা ব্যক্তিগত, পরিবার গত এবং সমাজ গত অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় বলিয়া তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য (Touch not, taste not, handle not) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জনৈক পাশ্চাত্য কোবিদ মদ্যকে অভাবের জননী এবং পাপের ধাত্রী (Mother of want and nurse of crime) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন সুতরাং নীতি হিসাবে যে মদ্যপান অত্যন্ত দোষাবহ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মদ্যের সুস্থ শরীরে উপযোগিতা আছে কিনা তাহা স্থির করা। সুতরাং ঐ সকল মতবাদ এই প্রবন্ধের পরিপোষক হহে।

মদ্য পানের হিতাহিতত্ব নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে দেখা যাউক —এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন? নিম্নে মদ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল কথা আয়ুর্ব্বেদে আছে তাহার মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইতেছে।

চরকের চিকিৎসা স্থানে মদাত্যয় চিকিৎসার প্রথমেই লিখিত আছেঃ—"দেবগণ ইন্দ্রের সহিত যে সুরার পূজা করিয়াছিলেন, যে সুরা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা বৈদিক কর্ম্মদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যাহা ইন্দ্রের যজ্ঞেও প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্র মন্থনে নীর হইতে উত্থিত, যে সুরা যজ্ঞেও হিতকারিণী বলিয়া যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য বেদ বিহিত বিধি সমূহ সহকারে যজমান্ মহাত্মগণ কর্ত্তৃক দৃশ্য ও স্পৃশ্য হইয়া থাকে, যে সুরা—উপাদান, সংস্কার ও নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু প্রকার হইলেও সাধারণতঃ মত্ততা জন্মায় বলিয়া এক প্রকার, যে সুরা অমৃতরূপে দেবতাদিগের, সুধারূপে পিতৃদিগের ও সোমরূপে ঋষিদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ সম্পাদন করে, যে সুরা অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের মহৎ তেজঃস্বরূপ, সরস্বতীর বীর্য্য স্বরূপ, ইন্দ্রের বল স্বরূপ, যে সুরা সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপ, রতি স্বরূপ, বাক্য স্বরূপ, পুষ্টি স্বরূপ ও সুখ স্বরূপ, যে সুরা শোক দুঃখ ভয় ও উদ্বেগ নাশক, যে সুরা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য কর্ত্তৃক সুধানামে অভিহিত হয়, সেই সুরা বিধি পূর্ব্বক পান করিবে।"

মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলার পর মদ্য পানের বিধি কি তাহা বলা হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা লিখিত হইল না। মদ্যের অপকারিতা চরকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

মদ্যের দোষের কথা বলিবার পর চরক পুনরায় বলিয়াছেন,—কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের ন্যায়,অযুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে রোগ উৎপন্ন করে, কিন্তু যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকার করে। অন্ন—প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ, কিন্তু অযথারূপে সেবিত হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। মদ্যও অযথারূপে প্রযুক্ত হইলে প্রাণহর বিষের ন্যায় হয় এবং যুক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে রসায়নের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

মদ্য যুক্তি পূর্ব্বক,পান করিলে হর্ষ, দেহ, পুষ্টি, আরোগ্য, পুরুষত্ব বৃদ্ধি এবং মত্ততা, জন্মিয়া থাকে। মদ্য রুচিকর, অগ্নিদীপক তৃপ্তিজনক, স্বর ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, প্রীতিকর, পুষ্টিকর, বলকর, ভয় শোক ও শ্রমনাশক, যাহাদের নিদ্রা হয় না তাহাদের পক্ষে নিদ্রাজনক, যাহারা লোকের কাছে ভাল কথা কহিতে পারে না তাহাদিগের বাক্‌শক্তি বর্দ্ধক, যাহাদের অধিক নিদ্রা হয় তাহাদের নিদ্রার অল্পতাকারক, যাহাদের মল মূত্রের বিবন্ধ আছে অর্থাৎ মল মূত্র ভালরূপ নির্গত হয় না, তাহাদের বিবন্ধ নাশক এবং আঘাত বন্ধন, এবং অন্যান্য ক্লেশ জনিত দুঃখ নাশক।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, স্নিগ্ধ অন্ন এবং মাংসের সহিত মদ্য সেবন করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধি হয়, কমণীয়তা, মনের সন্তুষ্টি; ধৈর্য্য তেজ এবং অত্যন্ত বিক্রম জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রে মদ্যপানের চারিটী অবস্থা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় মনুষ্যের কিরূপ সুখজনক তাহা নিম্নে লিখিত হইয়াছে। অপর তিনটী অবস্থা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঐরূপ অবস্থা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ঘটিয়া থাকে।

প্রথম মদে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি ও সুখ জন্মে, যথেষ্ট পানাহার করিতে পারা যায়, রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, পাঠ ও গান করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, স্বরের উৎকর্ষ ঘটে। এই প্রথম মদ অর্থাৎ অল্প মদ্যপান জনিত যে মত্ততা তাহা অত্যন্ত রমনীয়। চরক বলিয়াছেন যে, প্রথম মদে যুবক বা বৃদ্ধদিগের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থে যে প্রীতি জন্মে পৃথিবীতে তাহার উপমা নাই। যুক্তি পূর্ব্বক পীত মদ্য বহু দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং শোক গ্রস্ত ব্যক্তিগণের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। চরক ও সুশ্রুতে প্রথম মদের এইরূপ সুখ্যাতি থাকিলেও বাগ্‌ভট উহার সমর্থন করেন নাই, টীকাকার অরুণ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা সংগ্রহ কারের উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া পাঠকগণের বিচারের জন্য শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইল।

আদ্যে মদে দ্বিতীয়েচ প্রমাদায়তনে স্থিতঃ।
দুর্ব্বিকল্প হতো মূঢ়ঃ সুখমিত্যধি মুহ্যতে ॥

প্রথম এবং দ্বিতীয় মদে প্রমাদ বশতঃ দুষ্ট কল্পনা বশে মদ্যপ সুখ বলিয়া মনে হয়—উপরোক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এইরূপ। কিন্তু অরুণ দত্ত উহাকে দ্বিতীয় মদের লক্ষণ বলিয়া আদ্য মদে প্রকৃত সুখ ইহা উহ্য ধরিয়া লইয়াছেন, কারণ দেখাইয়াছেন যে তন্ত্রান্তরে এইরূপ আছে। ন্যায়ান্যায় সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

মদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে মদ্যের যে

সকল গুণ বলা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা মদ্যের দোষ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব।

মদ্যপান বশতঃ মদ্যপায়ীর যে সাময়িক ক্ষুধা, বল, রতি শক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় উহা কি মদ্য সৃষ্টি করিয়া থাকে?—না শান্ত অশ্বকে কষাঘাত করিলে সে যেমন দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, মদ্যজনিত উত্তেজনায় ক্ষুধা, রতি এবং বলেরও সেইরূপ বৃদ্ধি হয়? সম্যক রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেষোক্ত কারণেই এইরূপ ঘটে বলিয়া বোধ হয়। পরে দেখান যাইবে মদ্য বলের বিপরীত গুণযুক্ত এবং বিপরীত গুণ যুক্ত মদ্য বলের অপচয়ই করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সাময়িক বলের বিকাশ—তাহাকে অশ্বকে কষাঘাত করার ন্যায় মদ্যহেতুক উত্তেজনা ও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। যখন মদ্য জনিত মত্ততা ছাড়িয়া যায়। সেই সময়ে ইহার প্রতি ক্রিয়ার ফলে মদ্যের উত্তেজনা বশতঃ সাময়িক যে বলের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, উত্তেজনা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বল চলিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বিগত মদ মদ্যপায়ীর দেহ বহন করাকে ভার বলিয়া মনে করে। সুতরাং মদ্য বল-জনক এ কথা বলা যাইতে পারে না, বলের সাময়িক উত্তেজক মাত্র—ইহাই বলা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ যে মদ্যকে বলবর্দ্ধক বলিয়াছেন তাহা—কি ভ্রমাত্মক? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, না ভ্রমাত্মক নহে? মদ্য শরীরকে উত্তেজিত করিয়া সাময়িক বল বৃদ্ধি করে ইহা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ওইরূপ বলিয়াছেন। কেননা তাহা না হইলে অন্যত্র মদ্যকে বলের বিরোধী বলিতেন না। আবার এই উত্তেজনা হেতু বলের বিকাশের, সুতরাং ক্ষয়ের পূরণের জন্য বলিয়াছেন যে, পুষ্টিকর স্নিগ্ধ অন্ন মাংস প্রভৃতি খাদ্য ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার কষ্টতম রোগ সকল উৎপন্ন হয় অথবা মৃত্যু ঘটে।

মদ্যকে যে রতি বর্দ্ধক বলা হইয়াছে তাহাও এইরূপ। কারণ মদ্য শুক্রনাশক। শুক্রনাশক দ্রব্য কখনই রতি বর্দ্ধক হইতে পারে না। মদ্য ক্ষণেক সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া বলের ন্যায় রতি শক্তির বৃদ্ধি করে মাত্র।

মদ্যপানে ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মদ্য পরিপাক যন্ত্র সমূহকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুধা জন্মায় এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া (ডাক্তারি মতে পাচক রস সমূহকে অধিক ক্ষরণ করিয়া) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

মদ্যপান বশতঃ মনের যে সাময়িক হর্ষ হয়—তাহাও চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ হর্ষই হয় কেন? দুঃখ শোকাদি হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, সাধারতঃ লোকে হর্ষ উদ্দেশ্য করিয়া মদ্য পান করে বলিয়া চিত্তের হর্ষই হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে লোকে মদ্যপান করিয়া ভয়ানক ক্রন্দন করে, শোক করে, বা ক্রোধ প্রকাশ করে। ফলতঃ মদ্যপানের ফলে যে সময়ে চিত্তের যে কোন ভাবই ঘটুক, মদ্যের উত্তেজনায় তাহা প্রবল হইয়া থাকে। চিত্তের এইরূপ অযথা উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া মত্ততা ছুটিয়া যাইবার সময় ঘটিয়া থাকে। সে সময়ের সাময়িক অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবসাদ, গ্লানি, অস্থিরতা, বিষন্নতা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে খোঁয়াড়ি ভাঙ্গা বলে।

শাস্ত্রকারদিগের সূক্ষ্ম উপদেশ বিপুল বুদ্ধি ব্যক্তিকেও আকুল করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির যে তাহাতে বিভ্রম ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে মদ্য ভয়, শোক ও শ্রমনাশক বলিয়া কথিত হইতেছে, কিন্তু সেই শাস্ত্রকারই আবার বলিয়াছেন:—

"মদ্যে মোহো ভয়ং শোকং ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাং" অর্থাৎ মদ্যে মোহ,, ভয়, শোক, ক্রোধ ও মৃত্যু সংশ্রিত রহিয়াছে। যাহা ভয় শোক উৎপাদক, তাহা কি প্রকারে ভয় শোক নাশক হইতে পারে। অপিচ, সুশ্রুতে ক্রুদ্ধ, ভীত শোকগ্রস্ত, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথশ্রম বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে পানাত্যয়াদি বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ কোন বিষয়ে পক্ষপাত না করিয়া সকল দ্রব্যেরই দোষ গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবস্থা ভেদে, যুক্তি বা অযুক্তি পূর্ব্বক পান করার জন্য মদ্যে উপকার বা অপকার বিচার করিয়া উপরোক্ত বিভিন্ন মতের সমাবেশ করা হইয়াছে। চরকে মদ্যের দোষ প্রদর্শন কালে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মদ্য দোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে শাস্ত্রে মদ্যের যে দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। বাগভট প্রথম ও দ্বিতীয় মদকে যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, মদ্য উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শরীরের শৈত্য গুণ নষ্ট করিয়া পিত্তকে কম্পিত করে, তীক্ষ্ণতা, প্রযুক্ত মনের গতি নষ্ট করে অর্থাৎ বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক কার্য্যে বাধা জন্মায়, সূক্ষ্ম শরীরে (অর্থাৎ হৃদয়াদিতে) প্রবেশ করে, বিশদ গুণ (পিচ্ছিলের বিপরীত) বলিয়া বল ও শুক্রকে নষ্ট করে, রুক্ষ বলিয়া বায়ুকে কুপিত করে আশুকারিতা প্রযুক্ত হটকারিতা (হটাৎ কোন কাজ করা) জন্মায়, ব্যবয়ি বলিয়া রতি প্রশক্তি জন্মায় এবং বিকাশী বলিয়া শীঘ্রই সমান ধাতুতে মিশ্রিত হয়।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে:—বিষে যে সকল গুণ আছে মদ্যেও সেই সকল বর্ত্তমান। প্রভেদ এই যে, বিষে অধিকতর প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে। বিষের গুণ সকল যেমন ত্রিদোষ প্রকুপিত করে, মদ্যের গুণ সকলও সেইরূপ ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) কুপিত করে। কোন কোন বিষ সত্বর প্রাণ নাশ করে এবং কোন কোন বিষ রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগ ও বিষের ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

তুত্থকাদি তৈল।

—:*:—

(কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ)।

এই তৈলের ফর্দ্দটি একজন প্রাচীন চিকিৎসকের নিকট হইতে অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ক্ষতরোগে এরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। কিন্তু এতদিন

ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। কেননা আমরা অধিকাংশ ক্ষতের চিকিৎসাই ডাক্তারী মতে করিয়া থাকি। কাজেই এতদিন ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের হাঙ্গামে ডাক্তারী ঔষধের মূল্য অসম্ভব বর্দ্ধিত হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া একটি ক্ষতরোগীকে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহার উপকারিতা দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। যাঁহারা ক্ষতচিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা হীনপ্রভ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার ইহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। Oil carbolic যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই তুথকাদি তৈলও সেই অবস্থায় ব্যবহার্য্য। সাধারণের অবগতির জন্য ঔষধটি প্রকাশ করিয়া দিলাম।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারু হরিদ্রা, বট ছাল, পাকুড় ছাল, যজ্ঞ ডুমুর ছাল, অশ্বথ ছাল, কদম্ব ছাল, বাবলার ছাল, অম্লবেতস ছাল, করবী মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, কুড়্চি ছাল, নিম পাতা,

এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রত্যেকটি আড়াই আনী ওজনে গ্রহণ করিবে। পরে চল্লিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (দশ তোলা) থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

নারিকেল তৈল ২০ তোলা
পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ১০ তোলা

উভয়ে একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ উহাতে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৈলে জলীয়াংশ দৃষ্ট না হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মনসা সীজের পাতার রস ১০ তোলা
অপামার্গ পাতার রস ১০ তোলা
মুদ্রাশঙ্খ চুর্ণ অর্দ্ধ তোলা
শোধিত গন্ধক চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা

পাক কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে খর অথবা মৃদু পাক না হয়। খর ও মৃদু পাকের ঔষধে ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পাক সমাধা হইলে উহাতে তুঁতে ভস্ম মিশ্রিত করিতে হয়। ক্ষতে বেশী পচা থাকিলে তুঁতে ভস্ম অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিবে। পরে ক্ষত ক্রমশঃ যতই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে তুঁতের মাত্রাও ততই কমাইতে হইবে। তবে কোন সময়েই এক সিকির কম ব্যবহার করিবে না। ইহার নাম তুথকাদি তৈল।

নিম পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া উক্ত তুথকাদি তৈল দ্বারা প্রত্যহ পলিতা ভরিতে হইবে। সে সুবিধা না থাকিলে এক খণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া তৈলে ভিজাইয়া লাগাইয়া দিলেও চলিতে পারে। একটি পেঁয়াজ ও দুই তোলা ময়দা একত্র বাটিয়া গরম করতঃ পুলটিশ প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্ষতের আকার বুঝিয়া পুলটিশ ছোট বা বড় করিবে। ক্ষতের উপর একখণ্ড কচি কলার পাতা দিয়া তদুপরি উক্ত পুলটিশ প্রদান করতঃ ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। এইরূপ ৬।৭ দিন ধৌত করণান্তর (Dressing) ক্ষতে পচা না থাকিলে অর্থাৎ ক্ষত বিশুদ্ধ হইলে পশ্চাৎ নিম্ব ঘৃত প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ ক্ষতে নিম্ব ঘৃত প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র এই তুথকাদি তৈল প্রয়োগে ও ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

উক্ত প্রাচীন চিকিৎসক মহাশয় নানা প্রকার পলিতা ও নানাপ্রকার তুলা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

—:*:—

(রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর)।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনোযোগের সহিত প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে সক্ষম হইবেন এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কতিপয় ভয়ানক সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে সপরিবারে রক্ষা পাইতে পারিবেন।

নিয়মগুলি অতি সংক্ষেপে লেখা হইল। স্থানের অল্পতা বশতঃ নিয়মপালনের কারণগুলি বিস্তৃতভাবে এ স্থানে বর্ণিত হইল না। স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন ভাল পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে।

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নির্ম্মল জলপান, পুষ্টিকর নির্দ্দোষ খাদ্য গ্রহণ, যথোচিত ব্যায়াম, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান এবং আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ বাসগৃহে অবস্থান, এই কয়টির একান্ত প্রয়োজন। ইহাদের যে কোনটির অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন।

বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ। বায়ু না থাকিলে আমরা এক দণ্ডও বাঁচিতে পারিতাম না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের নির্ম্মল বায়ু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু যে বায়ু প্রশ্বাসরূপে আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত, কারণ উহার সহিত শরীরের নানাবিধ দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পাই, তৎসম্বন্ধে দু একটি কথা নিম্নে লিখিত হইল।

১। বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলো আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর চারি পাশে খানিকটা খোলা জায়গা থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চারিটি ঋজু ঋজু জানালা এবং দরজা রাখিলে বায়ু ও আলোক প্রবেশের বিশেষ সুবিধা হয়।

২। গৃহের পোতা উঁচু করিবে। অবস্থায় কুলাইলে ঘরের মেজে পাকা করিয়া লইবে। মেজে স্যাঁৎস্যাঁতে থাকিলে সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

৩। বাসগৃহের অতি নিকটে বড় গাছপালা বা বাঁশের ঝাড় অথবা ঝোপ জঙ্গল থাকিতে দিবে না।

৪। গৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে কখনই বাস করিবে না। শীতকালেও শয়নগৃহের অন্ততঃ দুইটি বায়ুপথ খোলা রাখিবে।

৫। অনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে শয়ন করিবে না কারণ বহুলোকের শ্বাসক্রিয়াদ্বারা গৃহের বায়ু অতি শীঘ্র বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

৬। গ্রামের জল যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। গ্রামবাসীদিগের এই বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে সহজেই সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে যথাপ্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাইতে পারিবেন।

৭। বাড়ীর নিকট ছোট খানা ডোবা ইত্যাদি থাকিলে মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে। খানা ডোবায় পাতা ইত্যাদি পড়িয়া পচিয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐ সকল স্থানে মশক জন্মিয়া গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে।

৭। গ্রামের পথে ঘাটে, পুষ্করিণীর পাড়ে বা নদীর ধারে কখনও মলত্যাগ করিবে না। এই কদর্য্য অভ্যাসের ফলে গ্রামের জল ও বায়ু অতি শীঘ্র অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

৯। বাড়ীর আশে পাশে ময়লা থাকিলে বায়ু শীঘ্র দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া পড়ে। এই জন্য বাসগৃহ হইতে কিয়ৎ দূরে গোশালা ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান নির্ম্মাণ করিবে। পরিত্যক্ত মল ও আবর্জ্জনাদি যাহাতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সে ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে উহার উপর তৎক্ষণাৎ শুষ্ক মাটি বা ছাই চাপা দিবে।

১০। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ নিজ গৃহ ও তাহার আশ পাশ এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামের বায়ু সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবে।

"নিজ গৃহ আশ পাশ রাখ পরিষ্কার।
গ্রামখানি ছবি সম দেখাবে আবার॥"

নির্ম্মল জল পান।

জলের আর একটী নাম জীবন। আমরা যে জল পান করি, তাহা নির্ম্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমাদিগের কতকগুলি কদভ্যাসফলে পল্লীগ্রামের জলাশয়ের জল এরূপ দূষিত হইয়া পড়ে যে, উহা পান করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। জলাশয়ের নিকটে মলমূত্রত্যাগ, পুষ্করিণীর মধ্যে মনুষ্য ও পশুদিগের স্নান, ময়লা ও সংক্রামক রোগদুষ্ট কাপড় ও বিছানা কাচা সকড়ি বাসন মাজা, জলশৌচ ও মূত্রত্যাগ ইত্যাদি নানা অপবিত্র কার্য্যদ্বারা জলাশয়ের জল সর্ব্বদা দূষিত হইয়া থাকে।

১। প্রতি গ্রামে একটী বা দুইটী ভাল পুষ্করিণী কেবল পানীয় জল সংগ্রহের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা উচিৎ। ইহাতে কেহই স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, এমন কি মুখ ধুইতেও পারিবে না। যদি একটী পাম্প (pump) দ্বারা জল উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পুষ্করিণীর জল কোন মতেই দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পুষ্করিণীর পাড়ে বড় গাছ বা বেশী জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। পাতা পচিয়া জল নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা যথেষ্ট রৌদ্র পায় না।

৩। স্বল্পগভীর কূপের জল পান করা কখনও নিরাপদ নহে। যে কূপের জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, সেই কূপটীর

ভিতর দিক পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত এবং চারিপাশের জল যাহাতে কূপের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, কূপের উপরের জমি কিছু দূর পাকা ও ঢালু করিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণ কূপের জল প্রায় নির্ম্মল হয় না, এজন্য আজকাল অনেক দেশে লোহার নলের কূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ কূপের জল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে এবং কোন সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

৫। যদি কোন প্রকারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ জল যিনি পান করিবেন, তাঁহারই ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে পানীয় জল সহজে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে ইহার একমাত্র সহজ উপায়—জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা। এই উপায় দ্বারা জলের মধ্যে যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ থাকুক না কেন, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়. সুতরাং এরূপ সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই উপায়ে অতি সামান্য চেষ্টায় ও বিনা ব্যয়ে অনেক সাংঘাতিক রোগের আক্রমণ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। ফিল্‌টারের দ্বারা জল পরিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু খুব দামী ফিল্‌টার্ না হইলে তাহা দ্বারা রোগের বীজ জল হইতে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে সাধারণ ফিল্‌টারের উপর নির্ভর করিয়া আমরা একেবারে নিরাপদ হইতে পারি না। এরূপ স্থলে জল বিশুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—জল ফুটাইয়া পান করা। পার্‌ম্যাঙ্গানেট অব্ পটাস্ প্রভৃতি দুই একটি ঔষধের দ্বারা জল শুদ্ধ করা যায় বটে কিন্তু ঐ সকল ঔষধ সাধারণ পল্লীগ্রাম-বাসীর পক্ষে সংগ্রহ বা ঠিক ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে।

অতএব সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে জল ফুটাইয়া পান করিলে আমরা অনেক রোগের হাত হইতে বাঁচিতে পারি।

আহার ও পানীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে পুষ্টিকর নির্দ্দোষ আহার্য্য গ্রহণ ও পরিমিত ভোজনই সর্ব্ব প্রধান।

১। সহরে নির্দ্দোষ খাদ্য পাওয়া সুকঠিন, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও এ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, তেল, দুধ ও নারিকেলের মিষ্টান্ন পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইতে অসুবিধা হয় না। এই সকল খাদ্য সহজ পরিপাচ্য, পুষ্টিকর, অথচ দামেও সস্তা।

২। যাঁহারা মনে করেন যে, মাংস না খাইলে শরীর সবল হয় না, তাঁহাদের ধারণা ভুল। মাংসের মধ্যে যে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, ডাল, মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও সেই সারবান পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। মাছ বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা বাঙ্গালীজাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

৩। যাঁহারা কোনরূপ আমিষ দ্রব্য

ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, ঘি, দুধ, ছানা খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতে পারেন।

৪। ভাত অপেক্ষা রুটি সারবান খাদ্য। আমাদের দেশে একবেলা রুটির প্রচলন হইলে আমাদের দেহ আরও সবল হইবার সম্ভাবনা। ভাতের ফেন ফেলিয়া খাওয়া কখনই উচিত নহে; উহাতে চালের সারাংশ কতক পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। খিচুড়ি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন হইলে ভাল হয়।

৫। যাঁহারা ঘি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা খাঁটি সরিষার তৈল তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে প্রায় একই ফল পাইবেন।

৬। আমিষ বা নিরামিষ যে কোন পদার্থই ভোজন করা যাউক না কেন, গুরু ভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ। পেট সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করিয়া না খাওয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মিতাহার—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের এক প্রধান উপায়।

৭। প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাহার প্রশস্ত।

৮। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার দ্বারা খাদ্য যে কেবল হজম না হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৯। হাত মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করিতে বসিবে। যে স্থানে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং যেখানে আহার করা যায়, তাহা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১০। মাছি—ময়লা দ্রব্য ও রোগের বীজ পায়ের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। সুতরাং রান্নাঘরের মধ্যে এবং আহার করিবার স্থানে যাহাতে মাছি আসিতে না পারে এবং খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিলে মাছির উপদ্রব বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে বাড়ীর মধ্যে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা ঢাকা দিয়া রাখিবে।

১১। বাজারের খাবার যে দূষিত তাহার কারণ এই যে, উহা যে ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর সর্ব্বদা পথের ধূলা পড়ে এবং মাছি বসে। তদুপরি বাজারের খাবার প্রায়ই ভেজাল তেল, ঘি, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলখাবারের জন্য বাজারের খাবারের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের দেশের পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিড়া, মুড়ি, ছোলা বা মটরভাজা, ঝুনা নারিকেল কিম্বা নারিকেলের সন্দেশ ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অথচ সবিশেষ পুষ্টিকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খরচের দিক হইতে দেখিলেও ইহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

১২। আহারের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই অধিক জলপান বা বরফজল পান না করাই উচিত। উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১৩। সহজ শরীরে চা, কোকো বা

কফি পান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে ইহাদের মধ্যে কোনটাই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়।

১৪। সুস্থ শরীরে সুরা বা অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত বর্জ্জনীয়।

শরীর চালনা।

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না। মুক্তস্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যে কোন প্রকার ব্যায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ পনের মিনিট কাল অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ উপকারী। সুস্থ শরীরে দুই বেলায় অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা উচিত।

শরীর বা মনের অতিরিক্ত পরিশ্রম হইলে স্বাস্থ্যহানি হয় এবং মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব এ বিষয়ে ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বিশ্রাম।

শরীরের পক্ষে পরিশ্রম ও ব্যায়াম যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ করাও তদ্রূপ আবশ্যক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিলে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। রাত্রি কালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। রাত্রি কালে স্বল্পাহার সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত।

পরিচ্ছদ।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব সাদাসিদে অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন হইবে কিন্তু রুচিবিরুদ্ধ বা ময়লা হইবে না। ঘর্ম্মাক্ত বা ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)।

বসন্তরোগের চিকিৎসা। *

(কবিরাজ শ্রীকিরণচন্দ্র কণ্ঠাভরণ)

সকল বসন্তেই প্রথমে বমন করাইয়া পরে বিরেচন দিবে। দুর্ব্বলের পক্ষে বমন ও বিরেচনের ব্যবস্থা নাই, কেবল দোষনাশক দ্রব্যের পাচন দিবে।

বমনের ক্বাথ ও স্বরস্ প্রভৃতি।

পল্‌তা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাঁচ মাষা, তিন রতি, ক্বাথার্থ জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা

* স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রক্ষেপ * বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, ময়না ফল, প্রত্যেকে চূর্ণ ।/• অর্দ্ধতোলা, ঐ ক্বাথে মিলিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিলে পান করিবেক।

স্বরস। ব্রাহ্মী শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ।/• অর্দ্ধতোলা; হেলঞ্চা শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ।/• অর্দ্ধতোলা; নিমছালের রস ৪ চারি তোলা প্রক্ষেপ মধু ।/• অর্দ্ধতোলা।

বিরেচনের স্বরস। উচ্ছে পত্রের রস ৪ তোলা, প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ।/• অর্দ্ধতোলা।

এইরূপ বমন বিরেচনের দ্বারা রোগীর শরীর পরিশুদ্ধ হইলে সুবসন্ত উত্থিত হয়।

বসন্ত আরম্ভে মুষ্টিযোগ।

জয়ন্তী বীজ ২৫টা ঘৃতে বাটিয়া ৮ তোলা বাসি জলের সহিত পান করিবেক।

দোনার মূল ১ তোলা, মরিচ ২৫টা, আট তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

এইরূপ খাটাসী ১ তোলা উক্ত পরিমাণ মরিচ ও জলের সহিত সেবন করিবে।

ছরালভার মূল ২ তোলা—৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

ঐ প্রকার শিয়াল কাঁটার মূল, শিকটান কাঁটার মূল, অনন্তমূল ও যবাসমূলের † চারিটী মুষ্টিযোগ করিবে।

হরিদ্রা পত্র ১ তোলা, তেঁতুল পত্র ১ তোলা, ৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

২ তোলা মধু ৮ তোলা বাসি জলের সহিত সেবন করিবে।

শোধিত পারা ।/• অর্দ্ধতোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী করিয়া লইয়া পপ্পটী প্রস্তুত করিবে, ইহার ৪ চারি মাষকলাই পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিবে।

বসন্ত আরম্ভের পাঁচন।

কুমাড় লতার মূল পশ্চাৎ বক্তব্য বিধানানুসারে প্রস্তুত করিয়া ১০ কুঁচ হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পাচন প্রস্তুত করিবার দ্রব্যের ও জলের পরিমাণ :—

পাচন দ্রব্য, এক খানিই হউক অথবা অধিকই হউক, ২ তোলা পরিমাণ। জলের পরিমাণ ৩২ বত্রিশ তোলা। মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিবে, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া, সেই জল পান করিতে দিবে।

বসন্ত আরম্ভে জলসেক। বহুবার বৃক্ষের ‡ ছাল ৮ তোলা—৪৮ তোলা শীতল জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল রোগীর শরীরে সেচন করিবে।

বাতজ বসন্তের পাচন—বিল্বাদি। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, ছরালভা, বেণামূল, গুলঞ্চ, ধন্যা, মুতা, প্রত্যেকে ৯।/• কুঁচ লইয়া বিধানানুসারে পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

---

* কোন ক্বাথ অথবা পাচন পান করিবার সময় যে চূর্ণ দ্রব্য অথবা ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয় তাহার নাম প্রক্ষেপ।

ক্বাথ্য দ্রব্যের ও জলের এবং প্রক্ষেপ দ্রব্যের পরিমাণ গোবিন্দরাম সেনের পরিভাষার মতে লেখা গেল।

† খদির ভেদ, ক্ষুদ্র কণ্টকী বৃক্ষ। ‡ চালতা।

বাতজ বসন্তের পাককালের পাচন—গুড়ূচ্যাদি। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুরী, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, শ্বেত বেড়েলার মূল, বঁইচী মূল, প্রত্যেকে ১৩৷৹ কুঁচ।

পিত্তজ বসন্তের পাচন—দ্রাক্ষাদি। কিসমিস, পিণ্ডীখাজুর, গাম্ভারী ফল, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, খই, আমলা, দুরালভা, প্রত্যেকে ১৭৸৹ পৌনে আঠার কুঁচ।

শ্লেষ্মজ বসন্তের পাচন—দুরালভাদি। দুরালভা, ক্ষেৎপাঁপড়া, চিরতা, কট্‌কী, প্রত্যেকে ৪০ কুঁচ। এই পাচনটী পিত্তজ বসন্তেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ত্রিদোষজ বসন্তের পাচন, নিম্বাদি। নিমছাল ক্ষেৎপাঁপড়া, আকনাদি মূল, পল্‌তা, কটকী, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, প্রত্যেক ১৪৷৹ কুঁচ, প্রক্ষেপ ৷৹ অর্দ্ধতোলা।

পটোলমূলাদি পাচন।

পটোলমূল, রাঙ্গা নটিয়া শাক, আমলকী, খদির সার, প্রত্যেক ৪০ রতি।

পটোলপত্রাদি পাচন।

পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকমূলের ছাল, ধন্যা, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ক্ষেৎপাঁপড়া, প্রত্যেক ১৬ কুঁচ।

কাঞ্চন ছালের পাচন।

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল ২ তোলা। প্রক্ষেপ শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ৷৹ অর্দ্ধতোলা।

দ্বিতীয় পটোলমূলাদি পাচন।

পটোলমূল ও রাঙ্গানটিয়া শাক, প্রত্যেকে ৮০ কুঁচ। প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ২০ কুঁচ, আমলা চূর্ণ ২০ কুঁচ। এই পাচন বিস্ফোটক হাম রোগেও ব্যবহার করা যায়।

খদিরাষ্টক।

খদির সার, হরীতকী, আমলা. বহেড়া, মিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২০ কুঁচ। এই পাচনটীও বিসর্প, হাম, বিস্ফোটক রোগেও ব্যবহার করা যায়।

কফ-পিত্তজ বসন্তের পাচন—অমৃতাদি।

গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, পল্‌তা, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির সার. কেলেকড়া, নিম্ব পত্র হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকে ১৬ কুঁচ।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বিল্বকণ্টক, মরিচ, সমভাগ চূর্ণ করিয়া, ১০ কুঁচ পরিমাণে বাসি জলের সহিত সেবন।

রুদ্রাক্ষাদি চূর্ণ।

রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমান ভাগ চূর্ণ ১০ কুঁচ পরিমাণে সেবন, অনুপান জল।

পাপ রোগান্তক রস।

ষড়্‌গুণবলিজারিত মূর্চ্ছিত রস, বচ, পিপুল রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমানভাগ চূর্ণ করিয়া, তিন কুঁচ পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে।

পিত্তজ বসন্তের দাহাদিনাশক প্রলেপ।

শিরীষ বীজ, যজ্ঞডুমুরের ছাল, বাহুরার বৃক্ষের ছাল, অশ্বত্থ ছাল, বটের ছাল, সমান

ভাগ ঘৃত দিয়া নেকড়ার উপর প্রলেপ দিয়া, তাহা শরীরে বসাইয়া দিবে।

বসন্ত পাকাইবার ও দাহ নষ্ট করিবার প্রলেপ।

টাবালেবুর দানা—যবের কাঁজি দিয়া বাটিয়া ঐরূপ প্রলেপ দিবে।

কেবল পদে দাহ হইলে চেলুনী জলে সর্ব্বদা পাদধৌত করিবেক।

বসন্ত পাকাইবার অবলেহ।

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, অম্ল-দাড়িম্বের বীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩২ কুঁচ লইয়া, চারি তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত অবলেহ করিবে।

এইরূপ কুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত অবলেহ

বসন্ত পাককালের পথ্যাপথ্য।

মাংসবর্দ্ধক দুগ্ধ ঘৃতাদি আহার করিবে। শরীর শুষ্ক হয় এমত দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবে না।

বাতজ বসন্তের আরম্ভকালের পথ্য।

খই চূর্ণ সমান ভাগ চিনির সহিত শীতল জল দিয়া সেবন করিবে।

পল্‌তা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের যূষের সহিত ও কপোতের মাংসের যূষের সহিত ভোজন করিবে।

পিত্তজ বসন্তের পথ্য।

নিম, পল্‌তা, মুগ, তিক্ত দ্রব্যের যূষ, পুরাতন তণ্ডুল, যব এবং লঘু ভোজন করিবে।

বসন্তরোগের অপথ্য।

স্ত্রীসেবা, স্বেদ, শ্রম, গুরুদ্রব্য ভোজন, তৈল, রৌদ্র. কটুদ্রব্য, অম্ল, কোদধান্যের অন্ন, দুষ্ট জল, দুষ্ট বায়ু, ক্রোধ, বিরুদ্ধ ভোজন* বিষমাশন † এবং সীম, বসন্তরোগী পরিত্যাগ করিবেক।

উদরে বেদনা, আধ্মান ‡ ও কম্প হইলে পথ্য।

হরিণাদি মাংসের যূষ অল্প সৈন্ধব লবণের সহিত অথবা অম্ল দাড়িমের সহিত পান করিবেক।

পীতবর্ণ শাল বৃক্ষের ছাল ১ তোলা, খদির-সার ১ তোলা—৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া, সেই জল পান করিবে, অন্য জল পান করিবে না। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী)

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পত্র অথবা তুলসী পত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

হাড়মোড়ায়—পুঁই শাক অথবা শোনালুর পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হয়।

---

* দুগ্ধের সহিত মৎস্য প্রভৃতি ভোজন। † অধিক কিম্বা অল্প অথবা অকালে ভোজন।

‡ পেটফাঁপা।

* প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহৃত।

সর্ব্বপ্রকার বেদনায়— জয়পালের পাতা, ফল ও ছাল একত্র মিলিত ২ তোলা, সরিষার তৈল ।০ এক পোয়া একত্র ভাজিয়া লইবে, এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বেদনায় প্রয়োগ করা যায়।

প্রস্রাব বন্ধে—চাঁপাফুলের পাতার রস ২ তোলা খাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রদরে—অশোক ছাল ৫ তোলা, লালী গুড় ১ তোলা—/১ সের জল দিয়া জ্বাল দিয়া /।০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছুইবেলা সেব্য।

উপদংশে মলম—ভেড়ার লোম ভস্ম ।০ আনা, শামুকের টাটকা চূণ ॥০ আনা, তুতিয়া ভস্ম ।০ আনা, শত ধৌত গব্য ঘৃত ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আমড়া পাতার রস ও আমড়া উত্তমরূপে বাটিয়া দংশিত স্থলে প্রলেপ দিলে উত্তম ফল দৃষ্ট হয়।

বহু মূত্রে—পুরাতন কুল বীজ শাঁস ২টী ও শ্বেতচন্দন ১ তোলা—একত্র বাটিয়া খাইলে বহুমূত্রে বেশ ফল হয়।

হিক্কায়—হিং ঘৃতে ভাজিয়া এক টুকরা কাপড়ে পুঁটলী বাঁধিয়া ঘন ঘন ঘ্রাণ লইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়। অথবা হিক্কাগ্রস্থ রোগীর জিহ্বা টানিয়া বাহির করতঃ পুনরায় ছাড়িয়া দিলেও প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়।

প্লীহা রোগে—ঘুঘু পাখীর ডিম ১টী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই খাইলে প্লীহা রোগে বেশ কাজ করে।

রক্তাতিসারে—বেলছাল /০ ছটাক, জায়ফল /০ আনা, চিনি ॥০ তোলা—একত্র বাটিয়া প্রাতঃকালে ও বৈকালে কুটরাজের ছাল সিদ্ধ জল ২ তোলা—মধু ও জিরাভাজার চূর্ণ সহ সেব্য।

পাঁচড়ায়—কটু তৈল /৵০ পোয়া, রাই সর্ষপ /০ ছটাক, পচা মানকচুর ডাঁটা /০ ছটাক, গাঁজা /০ আনা,—একত্র ভাজিয়া ঐ তৈল ব্যবহারে খোস পাঁচড়া প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

বসন্ত রোগের নিদান ও চিকিৎসা—স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র কণ্ঠাভরণ। কয়েক বৎসর হইতে দেশে যেরূপ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে এরূপ পুস্তকের প্রকাশ যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের কথা। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার অনেকগুলি প্রচীন ও প্রামাণিক বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বনে ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। বসন্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-বিধিসকল এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ পাঠে দেশবাসীর উপকার হইবে। আমরা স্থানান্তরে ঐ গ্রন্থ হইতে "বসন্তরোগের চিকিৎসা" উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিলং পাহাড়।—শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ৪০ নং গরাণহাটা

ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা। গ্রন্থকারের শিলং ভ্রমণ উপলক্ষে গল্পচ্ছলে এই পুস্তকখানি লিখিত। এ পুস্তক পাঠে অনেক দেশের নূতন তথ্য এবং অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা সুন্দর এবং বাঁধান বেশ পরিপাটী। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সত্য গ্রহ।—নন্দিনী সম্পাদক শ্রীআশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবিশ প্রণীত। মূল্য এক আনা। ভারতবাসী সত্যাগ্রহীর দলকে উদ্দেশ করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত। গ্রন্থকার সত্যাগ্রহীর দলপুষ্টির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন ইহা ভারত সন্তানের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা,—না ইহা সময়োচিত হুজুগের জুয়ার মাত্র। বাস্তবিক সমগ্র ভারতবাসীর ইহা যে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নহে, ইহা তো সত্য কথা। যাহা মর্ম্মস্থল হইতে প্রকাশিত নহে তাহার জন্য বৃথা হুজুগে আত্মহারা হইয়া অশান্তিকে আলিঙ্গন করিবার কারণ কি? ভারতবাসীর প্রাণ চিরদিনই ধর্ম্ম বিজড়িত, সেইজন্য এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের মত আমরাও বলি ধর্ম্মোন্নতি দ্বারা শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় আমরা যতটা ধন্যমনা হইব, এই সত্য গ্রহের গড়লিকা প্রবাহে প্রধাবিত হইলে সেরূপ কখনই হইতে পারিব না. ইহার ভবিষ্যৎ ফলও যে শুভদ নহে, তাহাও সুনিশ্চিত। এ গ্রন্থে ভাষার ঝঙ্কার যথেষ্ট আছে। এ গ্রন্থের ভাবরাশি গ্রহণেও অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:—

শিশু মৃত্যুর হিসাব—ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১টি, বিহার ও উড়িষ্যায় হাজার করা ১৮০টি ও বঙ্গদেশে হাজার করা ১৮৫টি, শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমগ্র ভারতের হিসাব করিলে উহার হার ২০৬। আমেরিকার শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম। ফল কথা ভারতে ক্রমশঃ যেরূপ শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যান্য সভ্য দেশে সেইরূপ ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

শিশুর মৃত্যুর কারণ—ভারতীয় মহিলাদিগের স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবই ভারতে শিশু মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। ভারতে সূতিকাগৃহের জঘন্য অবস্থাও ইহার একটা কারণ অনেকে বলেন কিন্তু সূতিকাগৃহের জঘন্য অবস্থা আগেও ছিল, এখনও আছে, তবে সেই সূতিকা গৃহের জঘন্য অবস্থার ভিতরও আগে যে প্রসূতি ও শিশুদিগের সেঁকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এখন সেটা অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। অনেকে "পাঁচুঠাকুরে"র মানত করিয়া সেঁক তাপ গ্রহণ রহিত করিয়াছেন, অনেকে বা ইংরাজী অনুকরণে এ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজের সূতিকা-